KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেন্স, কল-৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher : শিশির [illegible] ?
Title : অন্যদিন (ANYADIN)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 5, 7, 8, 17	Year of Publication : ? ? 1971-72 আষাঢ় সংখ্যা ১৩৭৯
	Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : শিশির [illegible] ?	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা ত্রৈমাসিক

অন্য দিন

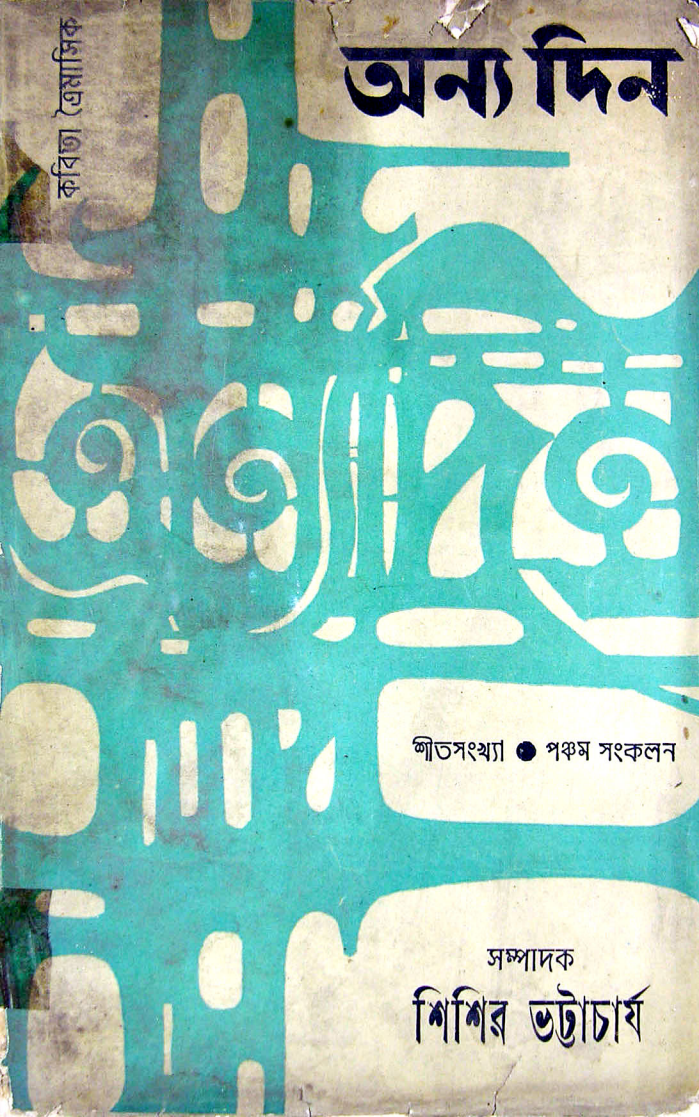

শীতসংখ্যা ● পঞ্চম সংকলন

সম্পাদক

শিশির ভট্টাচার্য

আই টি সি-র

বরাবরের লক্ষ্য—

আমদানির বদলে
স্বাবলম্বন

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড ও তার তামাক সরবরাহকারী সংস্থা ইণ্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড – এই দুই সংস্থা মিলে বহু বছর ধরেই সমানে চেষ্টা করে চলেছেন যাতে দেশে সমগ্র তামাক শিল্প সর্বতোভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

এদেশে উৎপাদন আর আত্মনির্ভরতার পথিকৃত এই দুই সংস্থা তামাক শিল্পের সহায়ক ছোটবড় বহু সংস্থা গড়ে তোলার জন্যে সমানে সক্রিয় সহযোগিতা আর উৎসাহ যুগিয়ে চলেছেন। যার ফলে এই সংস্থাগুলির পক্ষে সিগারেট উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় নানারকম যন্ত্রপাতি ও প্যাকিংয়ের সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

আমদানির উপর যখন বলতে গেলে কোনো বিধিনিষেধই ছিল না, তখন থেকেই এই দুই সংস্থা এ ধরনের সহায়তা দিয়ে আসছেন। এই সহায়তার মধ্যে আছে বিদেশ থেকে আনা কারিগরি সাহায্য এবং বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরির বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রির ব্যাপারে গ্যারান্টি এবং যেখানে যখন প্রয়োজন অপ্রত্যক্ষ আর্থিক সাহায্য। এসবের ফল হ'ল আগে যে সব জিনিস সবটাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হত, এখন সেগুলি এদেশেই তৈরি হচ্ছে। যেমন, ১৯৪৫ সাল থেকে প্যাকেট তৈরির জন্যে বোর্ড, ১৯৫১ সাল থেকে সিগারেটের কাগজ, ১৯৫৪ থেকে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল। প্যাকেট মুড়বার স্বচ্ছ ফিল্ম তৈরি হচ্ছে ১৯৫৭ থেকে, মাল পাঠাবার জন্যে দরকারী করগেটেড কার্ডবোর্ড বাক্স তৈরি হচ্ছে ১৯৬২ থেকে আর ফিল্টার টিপ পাওয়া যাচ্ছে ১৯৬৩ থেকে।

এই একই ধরনের সুযোগ সুবিধা আই. টি. সি. ভারতীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারীদেরও দিচ্ছেন। যার ফলে ১৯৬৩ সাল থেকে তাঁরা তামাক শিল্পের মূল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির সব রকমের খুচরো কল-কব্জা এদেশেই তৈরি করছেন। বর্তমানে মূল যন্ত্রপাতির প্রায় পুরোটাই এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিও বহুলাংশে ভারতেই তৈরি হচ্ছে।

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড এবং ইণ্ডিয়ান লীফ টোব্যাকো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড—দু'জনে মিলে ১৯২০ সালে এদেশে ফ্লু কিওরড ভার্জিনিয়া তামাক চাষ শুরু করেন। আত্মনির্ভরশীলতার পথে এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য স্থায়ী অবদান।

আজ এদেশে সিগারেট শিল্প প্রায় সম্পূর্ণভাবেই স্বনির্ভর। এর পেছনে রয়েছে মূলত ইণ্ডিয়া টোব্যাকোর প্রায় একক ও নিরলস সাধনা।

ITC

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড

বসন্ত সংখ্যা

অন্যদিন

আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে

পরবর্তী এই সংখ্যায় থাকছে

রবীন্দ্রনাথের উপর তথ্যবহুল নতুন একটি আলোচনা

•

কবির হস্তাক্ষর

•

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ ছন্দ

•

পঞ্চাশের পোড়ো জমি

ষাটের কবিতা

•

প্রবীণ-নবীন কবিদের সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ

•

ষাটের প্রতিনিধিদের কবিতাগুচ্ছ

•

ভারতীয় অন্য ভাষা ॥ কবিতা

•

বিদেশী কবিতা

•

গ্রন্থ সমালোচনা

৫৮/১২৮, লেক গার্ডেনস্, কলকাতা-৪৫ ফোন ৪৬-৩৭১৪

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

With Best Compliments of

MANJU STEEL TRADERS

★

MADRAS

অন্য দিন

অন্যদিন প্রধানত তরুণ কবিদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র। পরীক্ষা নিরীক্ষা মূলক জীবনধর্মী কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে।

●

যোগাযোগের ঠিকানা: ৫৮।১২৮ লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫
ফোন ৪৬-৩৭১৪

●

শ্রীনারসিংহ প্রেস, ৫নং বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে রামকৃষ্ণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮।১২৮ লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত।

●

দাম: একটাকা। বার্ষিক: চারটাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রবন্ধ

প্রেমেন্দ্র মিত্র * মণীন্দ্র রায় * সুশীল রায় * সন্তোষ কুমার অধিকারী

কবিতা

ওপার বাংলা

কঙ্কন নন্দী * মেজবাহউদ্দীন আহমদ খান * সৈয়দ আলি আহসান * আবুল কাসেম * মনিরুজ্জামান

এপার বাংলা

অন্নদাশঙ্কর রায় * দিনেশ দাস * বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অমিতাভ চৌধুরী * কৃষ্ণ ধর * লোকনাথ ভট্টাচার্য * সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় * শক্তি চট্টোপাধ্যায় * দিব্যেন্দু পালিত অনিল বরণ গঙ্গোপাধ্যায় * অমিতাভ দাশগুপ্ত * পবিত্র মুখোপাধ্যায় * শান্তনু দাস * পলাশ মিত্র * গৌরাঙ্গ ভৌমিক * সুচেতা মিত্র * বীরেন মিত্র * অমল ভৌমিক অরুণাভ দাশগুপ্ত * অমিত বসু * কুমারেশ চক্রবর্তী দীপক সরকার * রনজিৎ দেব * জ্যোতিষ ঘোষ * অমিতাভ চক্রবর্তী * রুদ্রেন্দু সরকার * রানা চট্টোপাধ্যায় * বিশ্বনাথ ঘোষ * লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় * শংকর দাশগুপ্ত * শিশির ভট্টাচার্য

ভারতীয় অন্যভাষা:

হিন্দী

স্বদেশ ভারতী

উর্দু
আলি সর্দার জাফরী * নাজির হালমী

পাঞ্জাবী
অমৃতা প্রীতম

ইংরেজী
প্রীতীশ নন্দী

বিদেশী ভাষা ঃ
ফরাসী
সেনেগাল—লেওপোল্ড সেংঘর
ফ্রান্স—জাক্ দুপ্যাঁ * মিশেল বনে দারমেজ

কবিতার মতো গল্প
জীবন সরকার

আলোচনা
শান্তনু দাস * রাজীব সেন

কবিতায় অরুচি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

"প্রচুর নীরস কচকচানি আজকাল কবিতার নামে চলে যাচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপী হল সেইসব 'নতুন' কবিরা উইলিয়ামস আর পাউণ্ডের কাছ থেকে ধার করা 'কবিয়ানা' নিয়ে যাদের বেপরোয়া ঘ্যানঘ্যানানির শেষ নেই।"

"দুঃখের কথা এই যে, ক্ষমতা যাই থাক, এই দলের কবিদের বড় বেশী শক্তি চোখ-কপালে তোলবার কি তামাসা করবার কবিতাতেই বাজে খরচ হয়।"

* * *

রাশি রাশি এমন তুচ্ছ কবিতা তারা বানায় লেখার মুন্সিয়ানার একটু ছাপও যার মধ্যে নেই।

তা ছাড়া নেহাত মামুলী সাধারণ ভাব ভাবনাকেও তারা গহন গভীর বলে চালাতে চায়।"

"বাইরের ঠাট-ঠমক যত অদ্ভুতই হোক, খারাপ লেখা আর মোটা ভাবনা দিয়ে ভালো কবিতা তৈরী হয় না।"

না, আমার নিজের বা এদেশের কবিদের কারুর লেখা থেকে উদ্ধৃতি নয়। ওপরের তিনটি মতামতই তরুণ আধুনিক মার্কিন কবিদের কাছ থেকে পাওয়া।

বিদেশী কবিদের এই সব মতামত পড়তে পড়তে কয়েক বছর আগেকার একটি মুশায়েরার কথা মনে পড়ল।

ঘরবন্দী ছোটখাট মুশায়েরা অর্থাৎ কবিসভা নয়। প্রায় মুক্ত প্রান্তরের কবিসভাই বলা চলে। কবিদের জন্যে একটা অস্থায়ী উঁচু মঞ্চ ছিল বটে, মাথার ওপর কোনরকম একটা আচ্ছাদনও। কিন্তু শ্রোতারা মাঠের ওপরই মুক্ত আকাশের নিচে ছড়িয়ে বসেছিলেন আর প্রায় জন পঞ্চাশ কবির নিজস্ব কণ্ঠের আবৃত্তি সেদিন নিদাঘের প্রথম রাত্রি স্পন্দিত করেছিল।

এ কবি সভার শেষে বেশ একটা মধুর আচ্ছন্নতা নিয়েই বাড়ি ফেরার কথা, কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে মনের সুরটা বেশ কেটে গিয়েছিল।

কবি সভায় যাবার পথে প্রথম ঘটনাটাই উল্লেখ করবার মত।

সভা যেখানে বসবার কথা সেখানে তখন সবেমাত্র একটি গানের আসর শেষ হয়েছে। দলে দলে পঙ্গপালের মত মানুষ সেদিক থেকে ফিরছে।

আসর ভাঙার পর ভিড় সরে যাওয়ার এ দৃশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবু যেন মনে হয়েছিল জনস্রোতের মধ্যে এমন কিছু আছে যা শঙ্কিত ব্যগ্রতার লক্ষণ।

গ্রীষ্মকাল ঠিকই, কিন্তু বায়ুকোণে কাল বোশেখীর কোনো ভ্রূকুটি ছিল না যে ভাবব, জনতার ত্রস্ত ব্যাকুল পদ চালনায় সেই জাতীয় আপদ্ এড়াবার একটা তাগিদ আছে।

সঙ্গী একজন কবিবন্ধু ব্যাপারটার একেবারে লাগসই উপমা দিয়ে বলে ছিলেন,—ওদিকে যেন 'ফ্রিট' দিয়েছে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, 'ফ্রিটই' একরকম। অন্য এক কবিবন্ধু সেইটেই বিশদ করে জানিয়েছিলেন যে কীটাতঙ্ক পিচকারীর কাজটা করেছে স্রেফ একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা।

ঘোষণাটি হ'ল,—এবার এখানে কবিতার একটি আসর বসবে। আধুনিক কবিরা স্বকণ্ঠে তাঁদের স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি শোনাবেন।

ব্যস! আর কিছু বলতে হয়নি। ওই একটি ঘোষণাতেই মাঠ ফাঁক।

পরিহাস করে বললেও কথাটা মিথ্যে নয়। আগের আসরে যেখানে তিলধারণের জায়গা ছিল না, সেখানে আধুনিক কবিদের সোচ্চার কবিতা শুনতে ছাড়াছাড়িভাবে দু দশটি শ্রোতাই মাত্র সেদিন উপস্থিত ছিলেন।

আধুনিক কবিতার বিচারক হবার স্পর্ধা আমার নেই, কিন্তু সে রাত্রে সেই খোলা মাঠের কবি সভায় যে সব কবিতা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার অনেকগুলিই উপেক্ষা বা বিদ্রূপ করবার মত নয় বলেই আমার ধারণা।

তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কবিকুল আর তাঁদের রচনা সম্বন্ধে ঠিক অবজ্ঞা যদি নাও হয় ব্যাপক একটা সুস্পষ্ট ঔদাসীন্যের কারণ কি হতে পারে তাই ভাবতে ভাবতেই সেদিন মুশায়েরা থেকে ফিরেছিলাম।

সমস্যাটা অবশ্য শুধু বাংলা কাব্যের নয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলিতে কাব্যের এই বিচিত্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে বলে শুনতে পাই।

কবিতার চর্চা আর কবির সংখ্যা যে অনুপাতে বাড়ছে সাধারণ পাঠক-সমাজের কবিতাসম্বন্ধে অনাসক্তি ও সেই পরিমাণে।

আধুনিক কবিরাই অক্ষম আর তাঁদের কবিতা বেশীর ভাগই অর্থহীন

প্রলাপ, এই চলতি মামুলী সাধারণের মন-ভোলানো যুক্তিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারলে আর কোনো ভাবনা নেই।

কবিতার আধুনিক যুগকেই এক কথায় নস্যাৎ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তাহলে বিষয়ান্তরে মন দেওয়া যায়। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে কোথায়?

কবিতার নামে ফাঁকি, চৌর্য, ও অনাচার এ যুগে নেই এমন নয়, সব যুগেই অল্প বিস্তর থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিতার নামে শুধুই ভেজালের কারবার চলছে এ কথা বলতে পারা যায় কি? অভ্রভেদী প্রতিভা না দেখা দিক, কবিতায় নব নব উন্মেষ একেবারেই যে বিরল নয় একথা স্বীকার করতেই হবে।

কাব্যরসাস্বাদে বর্তমান পাঠক সাধারণের ব্যাপক অনাসক্তির মূল তাই অন্যত্র সন্ধান করা বোধ হয় দরকার।

সাম্প্রতিক কবিতা সম্বন্ধে সব চেয়ে যা বড় নালিশ সেই দুর্বোধ্যতার ওপরও সব দায় চাপিয়ে সমস্যাটা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

সত্য কথা বলতে গেলে এখনকার জাল ও ভেজাল বাছাই করা কবিতা ঠিক দুর্বোধ্য নয় দুরূহ। শুধু কান পেতে রাখলেই যা মর্মে গিয়ে ঢোকে সেই সরল তরলতা এখনকার কবিদের সাধনা নয়।

দেশী বিদেশী আধুনিক কাব্যাদর্শের কূটতর্ক বাদ দিয়েই এটুকু বলা যায় যে মানুষের মনের ভাবনা অনুভূতি উপলব্ধিই অনিবার্য কারণে আজ জটিল স্ববিরোধে বিক্ষুব্ধ। কাব্য আর তার প্রকাশেও তাই একান্ত সহজ স্বচ্ছতা যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে কবিদের ক্ষমতার তারতম্য যাই থাক্, তাঁদের সততা সম্বন্ধে অন্ততঃ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এ যুগের কবিতার সঙ্গে জনসাধারণের যে বিচ্ছেদ ঘটেছে, তার জন্যে কবিদের নিরর্থক দুর্গমতায় আত্মনির্বাসন, না জনসাধারণের রুচি ও রসবোধের জড়তা ও অধঃপতন দায়ী, এ প্রশ্নও উপেক্ষা করবার নয়। এ প্রশ্নের মীমাংসায় অপ্রিয় সত্যও অস্বীকার করা চলবে না।

বর্তমান সভ্যতার কীর্তি অনেক ও অসামান্য। তা সত্ত্বেও তার অভিশাপের দিকটাও উহ্য রাখবার নয়।

মানুষকে পাইকারি হারে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দেবার উৎসাহে একটা স্থূল সমীকরণের উদ্যোগ ও সর্বত্র এখন চলছে। এই সমীকরণ ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম বিকাশ ও স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী বলেই সন্দেহ হয়।

আধুনিক গান বলতে যে বিচিত্র বস্তুটি আমাদের দেশেই আজ জনপ্রিয়তায়

অদ্বিতীয়, তার রচনা ও সুরের বাহারকে যদি এই সমীকরণের অন্যতম ফল বলে বুঝি তাহলে সেকাল বা একালের কবিতার অনাদরে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

আসল কথা বিদেশী বুলির তোতা পাখী হয়ে অনেকে অহরহ জন-সংযোগের যে ধুয়া তোলেন তার যথার্থ তাৎপর্যটা আগে বোঝা দরকার।

যে কবিতা মেঠো বক্তৃতার বিকল্প ছাড়া কিছু নয় তা বাদে, জনতা ও নির্জনতার আরাধনা এক সঙ্গে কাব্যে চলে কি?

কবির পক্ষে জন সংযোগ নিশ্চয়ই অপরিহার্য, কিন্তু যে সংযোগ জনে জনে পৃথক ভাবে,—নির্জনতার সঙ্গে আরেক নির্জনতার, এ যুগের খোলা মাঠের কবি সভায় যা অলভ্য।

দুর্বোধ্যতার দুর্নাম খণ্ডন করতে সাম্প্রতিক কবিদের হয়ে যত ওকালতিই করি সাধারণ পাঠকদের দিকটাও অবশ্য ভোলবার নয়।

কবিতা বা উচ্চাঙ্গের শিল্পের প্রতি সাধারণ মানুষের বিমুখতা ও ঔদাসীন্যের মূলে যান্ত্রিক স্থূল সমীকরণের অন্যতম গ্লানি স্বরূপ মনের রুচিবিকার ও অসাড়তা অনেকখানি অবশ্য আছে কিন্তু এ বিষয়ে আধুনিক-নামেই-তরে-যাওয়া কবিদেরও একেবারে বেকসুর খালাস দেওয়া যায় কি?

কবিতার নামে প্রলাপ পরিবেশনের মাত্রাধিক্যও কবি ও পাঠকদের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়াতে সাহায্য করছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ লেখার গোড়াতেই যে উদ্ধৃতিগুলি দিয়েছি তা থেকে অন্ততঃ এ আশা হয় যে দেশে ও বিদেশে আজকের দিনে যাঁরা নবীন, তাঁরা সবাই হুজুগের স্রোতে গা ভাসান নি।

সাময়িক সানাই এর পোঁ না ধরে তাঁরা কেউ কেউ স্বাধীনভাবে কবিতার কথা যে ভাববার সাহস রাখেন তার এমন একটি নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি, আমাদের কিছু কর্তাভজা কবি-সাহিত্যিক যা পড়ে ভিরমি যেতে পারেন।

'সম্প্রতি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান অ্যামেরিকার নেতৃস্থানীয় কবিদের এক সমাবেশে,'—লিখছেন ওই স্তরেরই স্বনামধন্য কবি জ্যাক গিলবার্ট,—"আমি তিন দিনের আলোচনার মধ্যে একবারও এলিয়ট-এর নাম উচ্চারিত হতে শুনি নি। বুদ্ধি, পুঁথিগত বিদ্যে আর অক্লান্ত মেহনৎ দিয়েই কবিতা বানানো যায় বলে যারা বিশ্বাস করে এলিয়ট তাদের কাছেই একজন কেওকেটা।" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কাব্যনাটক কী ও কেন

মণীন্দ্র রায়

কাব্যনাটক কী, এ প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করছিলাম কিছুকাল ধরে। নির্ভরযোগ্য কোনো উত্তর পেয়েছি তা বলা যায় না। তবু চিন্তার ধরণটা এখানে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

অনেকের ধারণা, কবিতাকে যদি দুই বা ততোধিক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলানো যায়, তাহলেই তা কাব্যনাটক হবে। এ রকম দু'একটি নাট্যাকার কবিতা চোখে পড়েছে আমার, কিন্তু মনে হয়েছে, দুটি চরিত্রই যেন দুটি আলাদা কবিতা আবৃত্তি করছে; এবং পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই। অর্থাৎ এদের উক্তি অনন্তকাল ধরেই সমান্তরালভাবে চলতে পারে; এদের মধ্যে মিলন বা বিরোধ নেই; কাজেই নাটকও নেই।

আরেকদল লেখক আছেন, যাঁরা দ্বন্দ্ববিরোধ বা সমস্যা আনেন বটে; কিন্তু তা এতই সূক্ষ্ম এবং কল্পজগতের যে ভালো করে ধরাছোঁয়ার আগেই হারিয়ে যেতে থাকে। সম্ভবত এঁদের বক্তব্য হল, কাব্যনাটকে কবিতার অংশটাই বেশি থাকা উচিত, আর সেজন্যে পার্থিব কোনো সমস্যা না ঢুকতে দেওয়াই ভালো।

অন্যদিকে এমন ব্যক্তিও আছেন, এবং তাঁরাই বোধকরি সংখ্যাধিক্যের দলে, যাঁরা কবিতার ছাঁদে লিখলেও মূলত নাটুকেপণার দিকেই বেশি জোর দেন, এবং সে নাটক, বলাই বাহুল্য, বেশির ভাগই হয় ঘটনাকেন্দ্রিক ও বাইরের দিকের ব্যাপার। আমাদের দেশের চিরাচরিত যাত্রার পালা এবং অসমপংক্তির অমিত্রাক্ষর পয়ারে লেখা অনেক নাটক এই ভাবেই লেখা হয়েছে। তবে এগুলোকে কেউ কাব্যনাটক বলে দাবি করেন নি, সাধারণ নাটক হিসেবেই গৃহীত হয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াল এই যে, পূর্বোক্ত ঐ তিন ধরনের কাব্যাকার নাটকের মধ্যে কোন নাটককে আমরা কাব্যনাটক বলতে পারি?

আমার বিবেচনায়, প্রথমে যে ধরণের রচনার কথা বলেছি, তা বড় জোর

সংলাপ-কাব্য হ'তে পারে, কিন্তু কাব্যনাটক নয়। কেননা তার মধ্যে নাটকীয়তা নেই। দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনা, অর্থাৎ যেখানে নাটকীয়তা হয়তো আছে, কিন্তু সেটা এতই নীরন্ধ্র নির্বস্তুক ও তুরীয় মার্গের জিনিস যে বীজগণিতের ব্যাপার মনে হয়, তাও কাব্যনাটক নয়। কেননা তার মধ্যেও নাটকীয়তার পূর্ণ উদযাপন নেই। এবং শেষোক্ত ধরনের রচনা, যা প্রধানতই বহিরঙ্গিক নাটুকেপণার ওপর নির্ভরশীল তাও কাব্যনাটক নয়, কেননা তাতে নাটকীয়তা থাকলেও কাব্যের ব্যঞ্জনা নেই।

তাহলে পূর্ণবৃত্তে ঘুরে এসে প্রশ্নটা আবার আমাদের মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে, কাব্যনাটক কী?

এককথায় বলা যায়, কাব্যনাটক হল সেই রচনা যার মধ্যে কবিতার ধর্মও আছে, নাটকের ধর্মও রক্ষিত হ'য়েছে। সকলেই জানেন, কবিতার মূল স্বধর্ম হল ব্যঞ্জনাসৃষ্টি, অর্থাৎ যা বলা হয় তার চেয়ে কিছু বেশি আভাস দেওয়া; আমাদের পরিণত চিন্তার ফসল যে ভাষা তার সাহায্যে রূপহীন অস্পষ্ট আবেগের মধ্যে অনুভূতির অনুকম্পন তোলা; যাতে যা জানি তার চেয়ে কিছু বেশি অনুভবের দিগন্তে আমাদের চিত্তপ্রসারণ ঘটে। আর নাটকের স্বধর্ম হল দ্বন্দ্ব; ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, কিম্বা আগেকার আমলে যেমন দেখা যেত, ব্যক্তির সঙ্গে তার নিয়তির বা নেমেসিসের; কিম্বা তার চেয়েও বেশি, ব্যক্তির নিজের চরিত্রের একটা অংশের সঙ্গেই অন্য আরেকটা অংশের, কিম্বা অসতের সঙ্গে সতের, না-র সঙ্গে হাঁ-র, অবক্ষয়ধর্মী সামাজিক শক্তির প্রতিভূ কোনো চরিত্রের সঙ্গে সংগ্রামশীল সৃজনধর্মী কোনো সামাজিক শক্তির প্রতিনিধির—মোটকথা যে কোনো উপায়েই হোক, দ্বন্দ্বমূলক অস্তিত্বের চেহারা ফুটিয়ে তোলাই নাটকের আসল কাজ। কাব্যনাটকে কবিতা আর নাটক দুটো দিকই যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এ কাজটা যেহেতু দুঃসাধ্য তাই তর-তম যদি করতেই হয়, এবং তা করতে হয় বলেই ধারণা, তাহলে কবিতার চেয়ে বরং নাটকের দিকেই বেশি নজর দেওয়া ভালো। কারণ? সেটা হল এই যে, যে মুহূর্তে রচনাটি মঞ্চস্থ করার কথা ভাবা হচ্ছে (কারণ নাটক মূলত লেখা হয় মঞ্চস্থ করার জন্যেই) সেই মুহূর্তেই মঞ্চের দাবিও তাকে কিছুটা মেনে নিতে হবে। তবে নাটকের মূল বক্তব্যটা যেন এমন হয় যাতে কাব্যিক আত্মানুসন্ধানের সুযোগ থাকে তার ভেতর; এবং তার ফলে সঙ্গীত ও সঙ্গতের মিলনের মতো এক অখণ্ড তৃতীয় সত্তার উদ্ভব ঘটে।

বলাবাহুল্য বক্তব্যের অস্পষ্টতা, তুচ্ছতা ও সেকেলেপনা দিয়ে এ ধরণের রচনায় সফল হওয়া সম্ভব নয়। যে কথা কেবল কবিতার মধ্যে রূপায়িত হলেও ক্ষতি ছিল না, কিম্বা যে কথা নাটকে মাপসই হলেও যা আগেই অন্য কেউ অন্য কোনো মাধ্যমে (যেমন গল্পে বা উপন্যাসে) প্রকাশ করেছেন, সেরকম বক্তব্য উপস্থাপিত করলেও কাব্যনাটক ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। যেমন হয়েছে আমাদের অনেক তরুণ কবি-নাট্যকারের। একদিকে নিরবয়ব কবিত্ব এবং অন্যদিকে কেবলি নরনারীরা হৃদয়বৃত্তি নিয়ে আত্যন্তিক মনোযোগ, যা শেষ পর্যন্ত 'বিয়ের গল্প' ছাড়া আর কিছু নয়—কাব্যনাটককে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রসোত্তীর্ণ হতে দেয়নি।

আমার তাই ধারণা, কাব্যনাটক এমন হওয়া উচিত যার মধ্যে সমকালীন যুগের প্রধান অন্তর্বস্তুটি তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যন্ত্রণা, এবং দীপ্তকল্পনায় রূপায়িত হতে পারে। অর্থাৎ রচনাটি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এমন হওয়া উচিত, যা দেখে (এবং পড়েও) মনে হবে, লেখক এমন কিছু উপস্থাপিত করেছেন যাতে আমাদের চলমান জীবনের অস্থির জটিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও সমাজবিবর্তনের একটি মূল সত্য রূপায়িত হয়েছে, এবং তা প্রত্যক্ষ করে আমাদের নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধেও সচেতন হতে পারছি আমরা।

আমাদের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এইভাবে যুক্ত হতে পারলে কাব্য-নাটকের সাফল্য এবং প্রসার অনিবার্য।

দীর্ঘদিন ধরে অজস্র ছোট ও বড়ো কবিতা লিখে যাওয়ার পর হঠাৎ কিছুদিন আগে কবি মণীন্দ্র রায়ের প্রথম কাব্য-নাটক 'ভীষ্ম' প্রকাশিত হতে দেখে, কবিকে তাঁর এই নতুন এক্সপেরিমেন্টের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে সম্পাদককে এই রচনাটি দেন।

আধুনিকতা ও কবিতা

সুশীল রায়

কবিতার কথা বলতে বসে, কোনো কবির নয়, একজন কর্মীর একটি উক্তির কথা মনে পড়ছে। বিবেকানন্দ বলেছেন—চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না। তাঁর উক্তিটি অবিকল এই রকম না হলেও তাঁর বক্তব্যটা মোটামুটি এই।

কবিতা-রচনা কাজটিকে মহৎ কাজ বলে স্বীকার করতে সম্ভবত কারও আপত্তি হবে না। যদি কেউ আপত্তি করেন তাহলে তার প্রতিবাদ করতে আমরা কুণ্ঠিত হব না। কুণ্ঠিত হব না, কেননা আমরা এ ব্যাপারটিকে মহৎ বলে মান্য করি।

মহৎ বলে মান্য করি বলেই কবিতা জিনিসটি আমরা সম্ভ্রমের সঙ্গে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। মন্দির মাত্রেই আমাদের কাছে নমস্য; কিন্তু আমরা জানি, সব মন্দিরই গগনস্পর্শী হয় না, সব মন্দিরের সোপানই স্ফটিকতুল্য নয়, সব চূড়াই স্বর্ণমণ্ডিত হবে না।

আমরা তেমনি জানি, সব কবিতাই অমৃতত্ব দাবি করবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু এটুকু আশা করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, সব কবির মনেই বলিষ্ঠ আশা রাখতে হবে, মনের ইচ্ছাটি ঘোষণা না করেও মনে মনে সংকল্প করে বলতে পারা চাই—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্। এ কথায় অনেকে হাসতে পারেন। কিন্তু সে হাসাটা হাস্যকর বলে মনে করবেন তাঁরা, যাঁরা কবিতাকে প্রকৃতই সম্ভ্রম করে থাকেন।

আমরা কবিতাকে সম্ভ্রম করি। এবং যাঁরা কবিতাকে সম্ভ্রম করেন তাঁদেরও সম্ভ্রমের চক্ষে দেখি। এটা নতুন কাজ নয়, চিরকালের মানুষ এই কাজ করে আসছে।

কিন্তু কাল এখন বদলেছে। এখন আমরা অকপট হতে দ্বিধা করতে শিখেছি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কপট হতে পারদর্শী হয়েছি। আমাদের মনের প্রতিধ্বনি

এসে তাই পড়ছে আমাদের কবিতাতেও। আমরা সেখানে চালাকি করছি। কবিতা লিখতে না পেরে আমরা লিখছি আধুনিক কবিতা। অক্ষমতা ঢাকার অপূর্ব কৌশল হিসেবেই আমরা এই পথে অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু, আমরা এটুকু সম্ভবত ভেবে দেখছি নে যে, এই পথের প্রস্থও যেমন ছোট, দৈর্ঘ্যও তেমনি বড় না।

অথচ তাতে যেন আমাদের কিছু আসে যায় না। কেননা আমাদের চাহিদার পরিমাপও খুব খাটো। আধুনিক-কবিতা জিনিসটা এসেছে একটি ফ্যাশানের মত। তথাকথিত কবিরা কতকগুলো লাগসই কথা বাছাই করে রেখেছেন, সেই ঝকমকে কথাগুলি উল্টেপাল্টে ব্যবহার করছেন, বন্ধুদের কাছে হয়ত বাহবাও পাচ্ছেন। তাতেই তাঁরা খুশী হচ্ছেন, আহ্লাদিত হচ্ছেন। উৎসাহিত হচ্ছেন, উৎফুল্ল হচ্ছেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে না, কত অল্পে তুষ্ট হবার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত করেছেন নিজেদের। নাল্পে সুখমস্তি হয়তো তাঁরাও বলছেন। কিন্তু অল্প জিনিসটার মাপ কি? এর পরিমাণ তো বাঁধা নেই। সুতরাং একজনের কাছে যা অতি-সামান্য, অন্যের কাছে তাই হয়তো অতি বৃহৎ বলে বোধ হচ্ছে। এটা আধুনিকতার লক্ষণ কিনা ঠিক বলতে পারব না।

অনেকদিন ধরে অনেক কবির উঠতি-পড়তি দেখতে-দেখতে আমাদের কাছে সব গোলমাল ঠেকছে। হঠাৎ আলোয় ঝলমল করে ভেসে উঠলেন একজন, কয়েকজন দর্শক উপরের দিকে চেয়ে বিস্মিত চোখে তাঁকে দেখতে দেখতে ঘাড় ব্যথা করে ফেললেন। অবশেষে ফানুশের মত চুপসে পড়ে গেল সেই খ্যাতিটা।

কবি-খ্যাতিটা এ ধরণের হাওয়া সমীচীন বলে মনে হয় না। এ-খ্যাতি একটা তারার মত হলে ভাল হয়—খুব ক্ষীণদীপ্তি হোক তাতে ক্ষতি নেই, খুব উজ্জ্বল হলে তো কথাই নেই।

কিন্তু তথাকথিত আধুনিক-কবিদের মনোভাবের প্রশংসা করব। তাঁরা খেলোয়াড়ি মনোভাব নিয়েই কাজে নামেন। দুদিন তাঁদের নিয়ে হৈ চৈ করার পরই তাঁদের যদি তারপর কেউ না চেনে তাতে তাঁদের যেন আক্ষেপ নেই। খেলোয়াড়দের জীবন তো এই ধরণের। এই যে মনোভাব, এরই মধ্যে আছে চালাকি। এই জন্যেই এ-জিনিসের প্রশংসা করলেও এ জিনিসকে সম্ভ্রম করা চলে না।

প্রত্যেককেই মহৎ কাব্যসৃষ্টি করতে হবে—এমন দাবি কেউ করে না। কেউ এ কাজ পারবে, কেউ পারবে না। অক্ষমতা কখনোই অপরাধ নয়।

কিন্তু অপরাধ হচ্ছে সেই জিনিসটি যা আমার দ্বারা সম্ভব নয় জেনেও আমি তা পেরে গেছে—এমনি ভঙ্গি করা, এবং অন্যের মনে এই ধরণের বিশ্বাস জাগিয়ে দেওয়ার জন্যে যাবতীয় কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হওয়া। এটা প্রচারের যুগ, সুতরাং আত্মপ্রচারেরও। এই জন্যেই সম্ভবতঃ গণ্যমান্য সাহিত্যিকের চেয়ে সামান্য সাংবাদিকের খাতির এখন বেশি। এখন সকলেই সাংবাদিকের শরণাপন্ন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই তাঁরা এ পথ নিয়েছেন। কিন্তু কিছুকাল আগেও এমন ছিল না। যাঁরা রচনা-কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাঁরা রচনা-কাজে আত্মমগ্ন থাকতে জানতেন।

এই জন্যেই মনে হচ্ছে, বুঝি সাহিত্যের মূল্যবোধই এখন কমে গিয়েছে। এই জন্যেই অল্পে তুষ্ট হতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। এই জন্যেই তথাকথিত আধুনিক-কবিতার এমন প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে। এই ধরণের জিনিসকেই সম্ভবতঃ মধুসূদন 'ইনসেক্টস্ অফ্ অ্যান আওয়ার' বলেছিলেন। অথচ, স্বল্পমেয়াদী জীবনে আমাদের যদি কোনো আপত্তি না থাকে তবে আমরা এক ঘণ্টায় পতঙ্গ-জীবন লাভ করেই বা ধন্য হব না কেন?

কবিতার সঙ্গে বর্তমান কালে আধুনিক শব্দটি যোগ করার দরুণ কবিতার ক্ষতি করা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা জন্মেছে। আমাদের চোখে অনেক কবিতা পড়ছে, তার মধ্যে অনেকগুলিতেই খাঁটি কবিতার স্বাদ রস ও ধ্বনি বেশ পাওয়া যায়, কিন্তু কবির হয়তো সহসা মনে হয় যে, যথেষ্ট আধুনিক হয়তো হচ্ছে না তাঁর লেখা, এই জন্যে সোজা ভাবে যে ছত্র তাঁর কলম থেকে এসে যাচ্ছিল তা তিনি একটু দুমড়ে দিয়ে আধুনিক হবার চেষ্টা করায় রচনাটা মার খেয়ে গেল। এ'কে অকপটতা বলা চলে না, এ'কে বলা যায় নিজের কাছেই নিজের প্রতারণা। প্রচারের দ্বারা আধুনিক-কবিতা নামক পদার্থটিকে খুব কদর দেওয়া হয়েছে, সুতরাং অপরিণতবুদ্ধি কবিদের কাছে তা লোভনীয় বলে বোধ হয়েছে। খাঁটি সোনা খনি থেকে উঠছে না, খাঁটি সোনার দাম তাই নাগালের মধ্যে না। সুতরাং জার্মান সিলভারের মত হয়তো মার্কিন গোল্ড বাজারে ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু এই গোল্ড জিনিসটা যে সোনা নয়, কিছুদিনের অভ্যাসের পর তা ভুলে যেতে হয়; তখন মনে হয়—এটিই সত্যিকারের সোনা, আর খনির সোনাটা মেকি। সেই জন্যে এইটে বর্জন করে সকলের নজর ঐ জেল্লাদার জিনিসটার উপর, যা খনি থেকে ওঠে নি, যা পাওয়া গিয়েছে ল্যাবরেটারির রসায়নে।

আমাদের তো ধারণা—আধুনিক কথাটা কবিতার কাছ থেকে সরিয়ে নিলে কবিদের অনেক উপকার করা হবে। তা হলে তাঁরা তাঁদের মনের খনির তিমিরগর্ভে যে সূর্যকান্তমণি আছে তা উদ্ধার করার দিকে মনোযোগী হতে পারবেন।

সব কালেই এই জিনিসটা আছে, যার নাম আধুনিক কাল। অনেকগুলো আধুনিক কালের সমবায়েই তো দীর্ঘকাল তৈরি। কিন্তু তারই একটি খণ্ডকে নিয়ে ক্ষণিকের জন্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টির দরকার বুঝি নে। সময়ের প্রবাহের সঙ্গেসঙ্গে রীতি-নীতি আচার-আচরণ পোশাক-পরিচ্ছদ বদল হয়, এমনকি ভাষারও কিছু পরিবর্তন ঘটে। আমাদের পিতামহরা যে ভাবে চলেছেন বলেছেন, আমরা সেভাবে চলি নে, সে ভাবে বলিও নে। আমাদের সাজ-পোশাকেরও বদল হয়েছে। কিন্তু আমরা সেই পিতামহদেরই উত্তরপুরুষ। তাঁদের সব-কিছু আমরা স্বীকার করে না নিলেও তাঁদের আমরা অস্বীকার করিনে। তাঁদের কালে তাঁরা আধুনিক ছিলেন, আমাদের কালে আমরা আধুনিক। সুতরাং এর মধ্যে কোনো অভিনবত্ব নেই। তাঁদের সময়ে তাঁরা যে কবিতা রচনা করেছেন তা ছিল সেকালের আধুনিক, আমাদের কালে আমরা যা রচনা করব তা একালের আধুনিক। এটা তো জানা কথা। অতএব ঐ জানা জিনিসটার বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে বিপরীত ঘটনা ঘটে গিয়েছে—বিকৃতি ঘটেছে। একালে আমরা নতুনভাবে ভাবব, পৃথিবীর বিস্তর পরিবর্তনের দরুণ আমাদের মনের পরিবর্তন ঘটেছে, কবিতা সেই পরিবর্তিত মনের প্রতিধ্বনি হয়ে বেজে উঠবে, স্বভাবতই তাতে নতুন সুর ফুটবে। এই সাধারণ ঘটনাকে নিয়ে আন্দোলন করার ঘটনাটা দুর্ঘটনা হয়ে উঠেছে।

কবি বিদ্যাসাগর

সন্তোষকুমার অধিকারী

গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টা বলে যাঁকে জেনেছি তিনি সমস্ত চেতনায় ও অনুভবে এক কবিপ্রাণ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর অন্তহীন প্রজ্ঞা ও বিপুল কর্মপ্রবাহিত জীবনের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকলেও, তাঁর প্রায়নীরব কবিহৃদয় একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। পাহাড়ের অভ্রভেদী চূড়া মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে রাখে; তার কঠিন রুক্ষ শিলাস্তূপ চোখে পড়ে। কিন্তু তবুও পাহাড়ের স্বতোৎসারিত ঝর্ণাধারা এবং শ্যামল উপত্যকার মাধুর্য স্তব্ধ হয়ে যায় না।

তিনি ছিলেন শাস্ত্রসাগর মন্থন করা অপরাজেয় পণ্ডিত; পাণ্ডিত্যের পৃথিবীতে তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে স্পর্শ করেছে অনেকে, বেঁধে রাখতে পারেনি কেউ! ছিলেন সমাজসংস্কারক নেতা; দুর্জয় বিক্রমে প্রতিপক্ষ মানুষদের নির্বীর্য করেছেন বারবার। আরও ছিলেন—এক অক্লান্ত বিদ্রোহী। যে বিদ্রোহী মাথা নিচু করতে শেখেনি কারও কাছে। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে অন্তরালে ছিল তাঁর হৃদয়—করুণায় উৎসারিত, অনুভবে বিদীর্ণ; নিঃসঙ্গ কিন্তু চেতনায় আলোকোজ্জ্বল।

শিল্পী যেমন তাঁর সেতারকে সুরে বাঁধেন, জীবনশিল্পীও তেমনি তাঁর জীবনকে ছন্দে বাঁধেন। যিনি ভাষায় সুরের ঢেউ তুলতে জানেন তিনি নিঃসন্দেহে কবি। কিন্তু যিনি জীবনের মোহনযন্ত্রে বিচিত্র জয়জয়ন্তীর আলাপ করতে পারেন তিনি কি? সমগ্র মহাভারতের মধ্যে কবি বেদব্যাস ব্যর্থতার করুণ নির্জনতা দিয়ে যে চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন, সে চরিত্র কর্ণের। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে নির্জন গিরিশিখর মাঠ বন নদী ছাড়িয়ে সকলের ঊর্ধে উঠে দাঁড়িয়েছিল সেও কর্ণের মতই পৌরুষে প্রদীপ্ত, তবু বেদনায় ও ব্যর্থতায় নির্জনতম প্রাণ।

কিসের এই ব্যর্থতা? কর্ণের মতই দরিদ্র অবহেলিত ঘরের সন্তান, সঙ্গে

ছিল সহজাত কবচকুণ্ডল—ব্রহ্মণ্য তেজ। পৌরুষের দীপ্ততায় মানুষের প্রতিরোধকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বিধবা-বিবাহকে সমাজে গ্রাহ্য করিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন কি নিদারুণ ব্যর্থতা! সমাজ বদলায়নি, মানুষ বদলায় নি। সভ্যতার মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে মানুষ আজও তেমনি ক্রুর, নিষ্ঠুর এবং বেদনাবোধশূন্য। জীবনের অন্তে এসেও তিনি নির্জনতম গিরিশিখর। সঙ্গে কেউ নেই; স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, বন্ধু নেই একজনও। আদর্শ মেট্রোপলিটান কলেজ ভেঙ্গে পড়ছে। ধ্বসে যাচ্ছে জীবনের এক একখানি ইঁট।

কেন এত নির্জন? কেউ বোঝেনি তাঁর মন? কেউ জানতে চায়নি তাঁর দুঃখ। তিনি যশ চাননি, অর্থ চাননি, খ্যাতি চাননি। চেয়েছিলেন হৃদয়। তাই হৃদয়হীন স্বজন এবং সমাজ থেকে তিনি সুদূর।

[দুই]

শৈশবের প্রথম চেতনা থেকে মানুষ যখন জ্ঞানের আলোকে জেগে উঠছে, তখন যা কিছু তার অনুভবকে আলোড়িত করে, তারই প্রভাব তার জীবনের ওপরে এসে পড়ে। শিশু তার জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করার পথে প্রথম পা ফেলে বর্ণপরিচয়ের পরিধিতে। সেদিন তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ হয়ে রয়েছে। বর্ণ উচ্চারণের ছন্দে হঠাৎ আকুল হয়ে উঠলো তার অনুভব। শব্দ আর মিলের আশ্চর্য সঙ্গতিতে সে মুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবে মাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা।"

শিশুর মনের কোনে কোন্‌খানে একটা সুর লুকিয়ে আছে। সেই সুরে ঘা দিতে পারলে তার সমস্ত চেতনা ছন্দে বর্ণে পুলকিত হয়ে ওঠে। বানানের বর্ণমালার শব্দে কি ব্যঞ্জনা তিনি দিলেন, ধ্বনির দোলা পাঠ্যবস্তুকে ছাড়িয়ে গেল। মনকে এক শব্দ রহস্যের বর্ণবিভূতি দিয়ে ভরিয়ে দিল। কবির ভাষায় —"এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

বিদ্যাসাগর হয়ত নিজেই জানতেন না, তাঁর মধ্যে এক কবির প্রাণ লুকিয়ে

আছে। কিন্তু তাঁর সদাজাগ্রত কান শব্দের ঝঙ্কারের মধ্যে দিয়ে অনুপ্রাসের যে সুর বুনেছে গোটা বর্ণপরিচয় জুড়েই তার পরিচয়।

নিবিড় অতিথি নিয়তি
শিশির অবিধি মিনতি ॥

একদিকে শব্দের ব্যঞ্জনা, ধ্বনির ঝঙ্কার মিলের সম্মোহ, অন্যদিকে এক অনির্বচনীয় চিত্রকল্প। বর্ষার বৃষ্টিধারা ঝড়ে পড়ছে আর গাছের পাতা সেই বৃষ্টিতে আন্দোলিত হচ্ছে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে।'

বর্ণপরিচয়ের পাতায় এই কাব্যরচনা—এত হঠাৎ সম্ভব হয়নি। সংস্কৃত কলেজে যখন তিনি ছাত্র তখন ত' শুধু ব্যাকরণ নয়, সংস্কৃত কাব্যসাগর মন্থন করে তিনি পান করেছিলেন। সাহিত্যশ্রেণীতে তাঁকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ···শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, বেণীসংহার, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তররামচরিত ও কাদম্বরী পড়তে হয়েছিল। একবার পরীক্ষায় পদ্যরচনার জন্যে একশ' টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। রচনার বিষয় ছিল "অগ্নীধ্র রাজার তপস্যা।" আর একবার আর একটি প্রতিযোগিতায় সংস্কৃত পদ্য রচনা করে একশ' টাকা পুরস্কার পান। কবিতাটির নাম "বিদ্যার প্রশংসা"। এই কবিতার ভাষায় যে সারল্য এবং মাধুর্য্যের প্রকাশ তা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিপুলঞ্চ বিত্তং
চিত্তং প্রসাদয়তি জাড্যমপাকরোতি।
সত্যামৃতং বচসি সিঞ্চতি কিঞ্চবিদ্যা
বিদ্যা নূনাং সুরতরুধরণীতলস্থ ॥

বিদ্যা বিকাশয়তি বুদ্ধিবিবেকবির্য্যং
বিদ্যা বিদেশ-গমনে সুহৃদ দ্বিতীয়ঃ
বিদ্যা হি রূপমতুলং প্রথিতং পৃথিব্যাং
বিদ্যা ধনং ন নির্ধনং নচ তস্য ভাগঃ ॥

এ ভাষা কাব্যেরই ভাষা ; সরল অথচ ছন্দময় এবং মধুর। তাঁর ছাত্র জীবনের ইতিহাস থেকে জানা যায়···মুখে মুখে তিনি সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদিতে গভীর জ্ঞানলাভ করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মত সংস্কৃত শব্দের অরণ্যেই হারিয়ে যাননি। বাংলাভাষায় রচনা লিখতে বসেও

তিনি এই সজাগ কাণকে কাজে লাগিয়েছিলেন। ভাষার লালিত্য সৌষম্য ও চলিষ্ণুতাকে তিনি সমন্বিত করেছিলেন।

"Poetry is the concrete and artistic expression of the human mind in emotional rhythmic language." অর্থাৎ হৃদয়ের অনুভবকে শিল্পীর সুচারুভঙ্গিতে ছন্দোময় ভাষার মাধ্যমে যখন প্রকাশ করা হয় তখন তাকে কাব্য বলে। গদ্যেও ভাষা ছন্দোময় হতে পারে। কবিতার ছন্দের মাত্রা ও অন্তমিল না থাকলেও গদ্যের ভাষাতে ছন্দের অন্তর্নিহিত মিল থাকতে পারে। এ পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ নিজেই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা পড়তে গেলে মনে হলে ভাষার মধ্যে সেই অনবদ্য ভাবের প্রকাশ যা একমাত্র কবিতাতেই সম্ভব। 'সীতার বনবাস' এর ভাষাও কবিমনের রূপানুভূতিকে একটি নিটোল ভাবময় দেহতে রূপ দিয়েছে। 'সীতার বনবাস'এর ভাষাতেও অন্তর্নিহিত ছন্দ ও মিল এর সুষম ও সুচারু প্রকাশ। ছন্দের এই সুর এবং ধ্বনির ব্যঞ্জনা 'সীতার বনবাস' এর মধ্যে খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতার যে সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করিয়েছে, তা নিচের উদাহরণগুলি থেকেই বোঝা যাবে।

"লক্ষণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয় ;···"

শুধু শব্দসমাবেশ নয় এমন কি ধ্বনির অপূর্ব সমন্বয়ে ছন্দবৈচিত্র্যের সৃষ্টি নয়, এই পংক্তি কটিতে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, এবং একটি নিটোল চিত্ররূপের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে তা' শুধু কবির হাতেই সম্ভব। অনুরূপ আর একটি উদাহরণ দিই জয়দেব থেকে—"মেঘৈর্মেদুরাম্বরম বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ পাশাপাশি যদি পড়ি

আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত···পংক্তি কয়টির কাব্যরূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'সীতার বনবাস' থেকেই আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

"দেখিলাম, প্রফুল্ল কমল সকল মন্দ মারুত দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সরোবরের নিরতিশয় শোভাসম্পাদন করিতেছে ;···"

"সীতা, চিত্রপটের আর এক অংশে দৃষ্টিযোজনা করিয়া, লক্ষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্বতে কুসুমিত কদম্বতরুর শাখায় ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য

করিতেছে, আর শীর্ণ কলেবর আর্য্যপুত্র তরুতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি গলদশ্রুনয়নে উঁহারে ধরিয়া রহিয়াছ, উঁহার নাম কি ?"

অনুরূপ উদ্ধৃতি শুধু 'সীতার বনবাস' নয়, শকুন্তলা থেকেও অজস্র দেওয়া যেতে পারে। শকুন্তলার এক জায়গায়—"রাজা কহিলেন, তাহার রূপ অনাঘ্রাত প্রফুল্ল কুসুমস্বরূপ, নখাঘাতবর্জিত নবপল্লবস্বরূপ অপরিহিত নূতন রত্নস্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধুস্বরূপ, জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশির অখণ্ড ফলস্বরূপ··"

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শকুন্তলা কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'এর অনুবাদ হ'লেও 'সীতার বনবাস' অনুবাদ নয়। 'সীতার বনবাস' পুরো উপাখ্যানটিই একটি কাব্য। 'করুণ বিয়োগান্ত কাব্য। এর প্রত্যেকটি চরিত্র কাব্য লক্ষণাক্রান্ত। বিদ্যাসাগরের হৃদয় যে করুণরসে আপ্লুত ছিল, তা' তাঁর এই বিষয় নির্বাচন ও সংস্থাপনের ঘটনা থেকেই জানা যায়। তাঁর আর একটি রচনার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। "প্রভাবতী সম্ভাষণ"। একটি গলিত কারুণ্যের নির্ঝর এই ছোট্ট রচনাটুকু। শুধু বেদনাবোধ নয়, জীবনের চরমব্যর্থতার হতাশাও এই কাব্যাংশের ছত্রে ছত্রে অনুরণিত।

"তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবনের কার্য্য করিতেছিলে।"

"তুমি উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া আমার দিকে বারংবার, যে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা আমার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় চিরদিনের নিমিত্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে।"

'প্রভাবতী সম্ভাষণে'ই বাংলা লিরিক কাব্যের প্রথম সূচনা—এ'কথা বলা যায় না কি ?

"বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার যথার্থ শিল্পী ছিলেন।" বিদ্যাসাগরের জীবন বলে, তিনি জীবনের কবি ছিলেন। সাহিত্যের আসরে শিল্পী হ'য়ে এগিয়ে আসতে তিনি সময় পাননি। তাঁর প্রবল কর্মজীবন ও সমাজচেতনা তাঁর কবিমনকে চাপা দিয়েছিল। তবুও বর্ণপরিচয়ের কবি 'সীতার বনবাসের' নিবিড় বেদনাশ্রুধারা থেকেই উঠে এসেছিলেন, এবং 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' এর বিদীর্ণ তুষার-সাগরেই তিনি অবগাহন করেছেন।

কঙ্কন নন্দী

আমার বাগানে কেউ গান গায় না

সম্প্রতি বাগানে বিশ্বাস নেই
নিয়মিত ফুল হাতে এলে খুশী হই
কারণ শুনেছি আমি
ফুলের পরাগ রেণু জনশক্তিতে করে জয়
সবার সবুজ প্রাণ

বাগানে বিরস কাব্য
আকাশ থেকে কাশবন সবকিছু কল্পনা বিলাসী
ক্ষণিক আত্মশুদ্ধি পরে জরদগবের ভূমিকা প্রদান
তবু জানি চাঁদ আর চাঁদোয়ার ছায়া সমান সজল

স্নেহময় নিভৃত-নিবিড়
বধূ আর বধূয়ার মুখ সমান আনন্দ দেয় প্রেমিকের মনে
তাস আর বাতাসের নেশা সমান উত্তাল-ঝড়—

বাধাহীন বেগে ধায়
ইতি আর ইতিকথা সমান বেদনায় আপরগতার ঢেউ তোলে
গান আর বাগানের সুর সমান হৃদয়হীন

মৌল কিছুই নয়
সম্প্রতি তাই আর বাগানে বিশ্বাস নেই
নিয়মিত ফুল হাতে পেলে খুশী হই
কারণ দেখেছি আমি
ফুলেল আকাশে শুধু বিরহের আত্মগাথা লিখা
ভালোবাসা বলে কিছু নেই

অনাবৃত মাংসল দেহেই তাই
চুমো খেয়ে বারবার মাছের ডিমের মতো দানা দানা
সমন্বিত অভিনীত রাতে আমার হৃদয় খোঁজে নিম্নাংগ ফুলের

মেজবাহউদ্‌দীন আহমদ খান

তিলকের মুখ কবিতার মতো

আমার অস্তিত্বকে ঘিরে ফসলের ঘ্রাণ
আমার অনুভবে মাটি আর এই দেশ
আমার আবেগে বেহুলার কথারা কথা বলে
বাউলের গানের মতোন,
আমি তো রবীন্দ্রনাথের আত্মায়।
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা আর কর্ণফুলীর মতোন
শোলক বলার কাজলা দিদির মুখের মতোন
ছায়া ঘন ঘেরা সোহাগের মতোন
এই আমি প্রান্তরের দৃশ্যপটে ওড়ানো ফানুশ,
জেনেছি আমার নাম আমিও মানুষ।...

সৈয়দ আলী আহসান

রবীন্দ্রনাথকে

হাঁসের সাদা পিঠের মতো
আমার শব্দগুলোকে যদি পরিচ্ছন্ন রাখতে পারতাম
আর বকের ঠোঁটের মতো যদি ধারালো করতে পারতাম,
তা' হলে আমি তোমার মতো হতে পারতাম—
না হলে কিছুটা কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টা থাকতো।
ধান কাটার শেষে মাঠের আদিগন্ত শূণ্যতা
যেখানে আমার চোখে,
বিত্তের উচ্চরোলে যেখানে কাঁচামাটির দেয়াল
ভেঙ্গে যায়,—
অনেক দীর্ঘ পথ যেখানে মরা ঘাসের উপর দিয়ে
হেঁটে যেতে হয়,—
যেখানে পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে বিদায়ের মতো
হৃদয়ের সূর্যাস্ত হয়,
সেখানে কুয়াশার দেয়াল তুলে
আমি জনারণ্যের মধ্যে একাকী,—
সেখানে পাখীর গান শুনে
হৃদয় সঙ্গী খোঁজে না।
তোমার পত্রান্তরালের শান্ত বিশ্রামের
কথা ভাবছিলাম।
নির্বাচিত শব্দের সঞ্চয়ে
সে বিশ্রাম চিরকাল সবুজ পাতা,
অবিনশ্বর শোভার লাবণ্যে
যা আমার আশ্রয় থেকে অনেক দূরে
আমার প্রতিদিনের ধূলায়
তোমাকে মলিন করবো না ;
তাই তো আমার শব্দে এবং ছন্দে
আনন্দ ও বেদনার বিমিশ্রিতা।

আমি তোমার মতো নিষ্কলুষ নই—
তাই আমার পদপাতে গ্লানি ও অনাশ্রয়,
যা আমার শব্দের উচ্চারণে
যত এনেছে অপরিচিত ক্ষেত্রে
এবং আমার উপমায়
পৃথিবীর প্রত্যূষে অন্ধকারের
মেঘলা ॥

আবুল কাসেম

প্রতারক শব্দাবলি

অন্যথা,
অন্যথা মাতাল হবো, রেস্তোরাঁর টেবিলে অনন্তের নৌকা এলে
বিজনেই হারাবো কোল্ডড্রিঙ্কএর স্বাস্থ্য
এমনকি রেকর্ডপ্লেয়ারের উচ্ছল কান্নায় ভাসবে উটপাখি।

সৌন্দর্য
উপবাসী ক্ষুধার বিবরে হে চাঁদ, তুমিও অবশেষে
নিদারুণ জোছনার প্রতিমা হলে
উপদ্রুত কান্নার শরীরে ছিনিয়ে নিলে তাকে
সেই মহাপ্লাবনের বিচিত্র রাত্রিকে।

মনিরুজ্জামান

তৃষ্ণার পাখী

নব নীপবনে
একটি হরিণ কত রূপে রূপে সূর্পনখা হ'য়ে আলো জ্বালে
ভালো লাগে হৃদয়ের চঞ্চল পরাগে তার মায়া।

রঙে রাঙানোর এত সুখ। প্রাণে এত গান।
পৃথিবীতে এই গান কবে নেমেছিল—অরুণা!
অবোধ কান্না হ'য়ে হৃদয়ে স্মৃতিরচৈত্রে,
পার যদি বল
যেখানে একটি হরিণ রূপে রূপে সূর্পনখা হ'লে
ভালো লাগে

এই গান কে গেয়েছিল!
অবোধ কান্নায় ভেঙে—এ হৃদয়ে
স্মৃতির চৈত্রে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

নব পদাবলী

শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে হিংসা সত্য
তাহার উপরে নাই।
হিংসায় যদি হাত রাঙা করে
সকলেই বনে জহ্লাদ!
তা হলেই হবে বিপ্লব, আহা!
তা হলেই হবে আহ্লাদ!
মারতে মারতে মরতে মরতে
থাকবে না কেউ বর্তে
মর্ত্যের লোক স্বর্গ পেলেই
স্বর্গ নামবে মর্ত্যে।

দিনেশ দাস

লেকের ধারে

লেকের জলের দিকে চেয়ে চেয়ে বলেছিলে যেন কোন্ ফাঁকে,
কী যেন গোপন কথা শোনাবে আমাকে।
মনে হ'ল, পাথরের সহরেতে তুমি এক নীল হ্রদ, নারী!
জলের বুদ্বুদগুলি তোমার শরীর ঘিরে
চুমকি-বসানো নীল সাড়ি।

চোখের পাতার মত ধীরে ধীরে যেই তুমি খুললে হৃদয়
মনে হ'ল বুদ্বুদের সাড়িখানি স'রে গেল হঠাৎ হাওয়ায়
টলটলে সবুজ প্রাণের জল ক'রে দিল সব জলময়
উদার উলঙ্গ মহিমায়।

সরোবর কিংবা তুমি—কার জলে তলিয়ে গেলাম,
মাছের মতই আমি সেই জলে সাঁতরাই রোজ
পাখা নেড়ে একটু একটু ক'রে সেই স্নিগ্ধ জল করি পান
কী সে জল ? কার জল ? আজও আমি পাইনিকো খোঁজ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আবহমান বাংলার কবিতা

'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে ?'
—ঘুমপাড়ানী ছড়া

বর্গীর চেয়েও
কে ভীষণ
বুলবুলি, ধান খেয়ে যায়
হেমন্তে

চাষীর ঘরে
কুপিও জ্বলে না, শিশু
পাখি দেখে ভয় পায়

সোনার বাংলায়
মুঠি মুঠি সোনা ধূলো হয়, জননীর
মুখে ঘুমপাড়ানীর গান
রোদনের মতো

মনে হয়
বুক থেকে উঠে আসা
বাংলার শপথ

রক্তে ভাসে।

অমিতাভ চৌধুরী

ছড়া

১
যদি আংরেজি না হটিতং
বলুন তো কী ঘটিতং ?
জনসঙ্ঘং চটিতং ॥

২
চীনের চেয়ারম্যান যদি হোন
আমার চেয়ারম্যান
চীনের খাবার আমার খাবার
হইবো না কও ক্যান ?

৩
লেকের ধারে প্রাতর্ভ্রমণ
নয় নিরাপদ আর,
মাংকি টুপির ভিতরে তাই
রাখুন রিভলভার।

কৃষ্ণ ধর

কোনো ঝিকিমিকি দীঘল বিকেলে

শহর ছাড়িয়ে ছোট লাইনের ট্রেনে
ঝিকিমিকি এক দীঘল বিকেলে
অনেক দূর গেলে
সোঁদা মাটির গন্ধ তমতমে লাউ ডগার চকিত চাউনি
আর হরিয়ালের ডাক
শুনতে শুনতে
এখানে আসা যায়।

মাঠগুলো খুব চেনা চেনা
পুকুরের বাঁধানো ঘাটটার বদলে
এক দুরন্ত শৈশবের কথা
মনে পড়ে যায়।

এই নদীটাও চেনা
কোনো রূপবতী বউ
একদা মনের দুঃখে
এই নদীতে ডুবে মরেছিল।

পদ্ম, শালুক আর কলমির বন নিয়ে
যে বিলটা নদীর খাড়ি থেকে
বেরিয়ে এসেছে
সেখানে রোদ-পোহানো কোন মাছরাঙাকে
একাগ্র তন্ময়তায়
বসে থাকতে দেখলে
সেই দুরন্ত ছেলেটাকে মনে পড়ে যায়।

এত সব কথা আর ছবি নিয়ে
কোনো ঝিকিমিকি দীঘল বিকেলে
এখানে এলে
দেখা মেলে চালচিত্রের মতো দিন
আর
জুজুবুড়ির মতো রাত্রির কাঁথায় মোড়া
এক বাংলাকে
তার বাসর লগ্ন কখন গেছে পার হয়ে
উৎসবের অতিথিরা গেছে ফিরে
এখন শুধুই অন্ধকার।

তার পোড়ো ভিটায় অনেক রাতে
শোনা যায় ভূতুমের ভয়ার্ত ডাক

সজারুর ঝুমঝুম শব্দ
তখন একটি কি দুটি মানুষ
আপন মনে অন্ধকারে হাত দিয়ে বলে ওঠে
রাতটা যেন আর কাটতে চায় না
এত বড় রাত।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

অথবা আধুনিক কায়দার

কান মুলিয়ে যারা আমায় কবিতা লিখিয়ে নেয়, সেই সব ব্যাঙের-ছাতা পত্র পত্রিকার সম্পাদক, আশ্চর্য, তারা কবিতাই পায়—অন্তত আত্মতুষ্টির অভিমান আমার সেই কথা বলে।

কোত্থেকে ঝরে, আশ্চর্য, ফুলের পাপড়ির মতো রেশমী সুবাস, ভিতরের কোন্ কমলালেবুর নির্যাস—যেন প্রস্তুতির মুহূর্ত ওৎ পেতে বসে আছে সারাক্ষণই, আনাচে-কানাচে, জামাকাপড় পরে তৈরী। কল খুললেই জল পড়বে।

তাই আক্ষেপ নেই নিরর্থক নিষ্কর্মা দিনে, যখন বাহাদুর বসন্ত রঙের বিজ্ঞাপনে-ফলশ্রুতিতে সোচ্চার, মশমশে জুতো ফেলে পায়চারী করে—কারণ জানি তো, এসো তুমি যে-কোন কেউ, ধাক্কা দাও দরজায়, আমি অমনি খিল খুলে তোমাকে আহ্বান করতে প্রস্তুত, আদিগন্ত অন্তরের হাসি-ছোঁওয়া ঠোঁটে।

চাও যদি বেরিয়ে যাব পথে, হ্যাঁ-গো-হ্যাঁ, তোমাকে নিয়েই দুটো কথা বলতে, বা কিছুই না বলতে।

অথবা আধুনিক কায়দার অন্য সেই তুমি যদি হও, না-হয় মর্মান্তিক ঠাট্টায় ছোরাটাই পিঠে চালাও, শেষ হয়ে যাই। তবু তখনো হৃদয়ের থমথমে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে থাকবেই দাঁড়িয়ে সারি-সারি কথাগুলো,

কপালে চন্দনের টিপ, হাতে বরমাল্য—যে কথা আত্মীয় মানুষের, মানুষকে ভালবাসার।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যা ছিল

শুকনো নদীর জলে পা ডুবিয়ে দুপুরের ক্ষণিক কৌতুকে
মন স্বচ্ছ হতে গিয়ে থমকে যায়
পাথরে শ্যাওলার ছোপ, ঝিরঝিরে স্রোতের মধ্যে
বাদামের খোসা
নদীর ওপার থেকে অনায়াসে নীরা নাম্নী মহিলাটি
কুচি ফুল নিয়ে ফিরে আসে
বালির ওপরে রাখে সোয়েটার
সিগারেট টেনে আমি মন খারাপ ধোঁয়া ছেড়ে
ভেঙে দিই বালির প্রাসাদ !

একদিন নদী ছিল চঞ্চলা নর্তকী,
তার তীরে
রমণীর লাস্য ছিল আরও রমণীয়
প্রবল ঢেউয়ের মতো হৃদয়ের ওঠানামা
ভুল ভাঙাবার মতো অকস্মাৎ কুল ভেঙে পড়া
নদীর ওপার ছিল দীর্ঘশ্বাস যত দূরে যায়—
নীরা, মনে পড়ে, এই নদীর তরঙ্গে
তোমার শরীরখানি একদিন
অপ্সরার রূপ নিয়েছিল ?
জলের দর্পণে আমি ডুব দিয়ে পাতাল খুঁজেছি
দেখেছি তা স্বর্গ থেকে দূরে নয়, কে কাকে হারায়
তোমার বুকের কাছে নীল জল ছলচ্ছল—সীমাহীন মায়া
আমার নিভৃত সুখ, আমার দুরাশা
এখন এ শীর্ণ নদী ··· বুকে বড় কষ্ট হয় ···
জলের সম্মুখে ছাড়া নারীকে মানায় না !

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পরশুরাম

অন্ধকার আর একটু জমুক, ঘুমুক পাশাপাশি ঐ পাড়াগুলো
আমরা পা টিপে-টিপে বের হবো তখনই
মুখের ওপর এঁটে নেবো মুখোশ
হাতে নেবো টাঙ্গি, যাতে রক্তের দাগ লেগে আছে
আমার নিজেরই রক্ত
প্রথম দিন ওকে আমার নিজের রক্ত খাইয়েছি
দিয়েছি রক্তের স্বাদ, করে তুলেছি হিংস্র সিংহ যেন

ওস্তাদ ওরাও ঠিক যেমন-যেমন বলেছিলো
আমি ওকে তেমনি ধীরে-ধীরে করে তুলছি জাগ্রত
বিষাক্ত, পোষমানা অথচ নির্ঘাৎ !
ওকে শীতে তেল মাখিয়ে স্নান করাচ্ছি রোজ
গা মুছে দিচ্ছি গামছায়
সিঁথিতে দিচ্ছি সিঁদুর পরিয়ে
শোয়াচ্ছি বুকের পাশে, যেন সহধর্মিণী···

তারপর পা টিপে-টিপে নেমে পড়ছি রাস্তায়
জমজমাট অন্ধকারে, অলিগলি, ঘর-বার সর্বত্র
একজনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি যে-ক্ষত্রিয় হয়েও
আমাকে ঘোর শত্রু করে তুলেছে।

দিব্যেন্দু পালিত

তোমরা এখন যাও

মুখের ভিতর ঘাম, এইমাত্র স্মৃতি ছুঁয়ে এসেছে নিঃশ্বাস—
পাপোষে রক্তের দাগ চ'লে আসে ঘরের মেঝেয়—।
বিস্তর যুদ্ধের পর ; রাস্তার দু'ধারে কোনো নির্মাণ ছিল না,

ছিলনা নারীর হাত, শিশুদের কোলাহল, বৃদ্ধের ভৎর্সনা—
কিংবা জলসত্র, পাপ ধুয়ে যায় তেম্‌নি উচ্চারণ—
এমন কি প্রথামতো বিকল্প ছিল না।

আমি তার হাতে দেবো মানপত্র, নিবীর্য মাটির
শস্যের আরকে পূর্ণ জয়ী দেবতার মদ, আমার শোণিত,
নির্ঘুম রাতের থেকে ছেঁকে-আনা স্বপ্ন আর কিছু
অস্ফুট ফুলের বীজ, অহংকারী উত্তরাধিকার—
দরজায় কপাট দেবো, বহুকাল পড়েছিল খোলা।

তোমরা এখন যাও, আমার বিশ্রাম জুড়ে চীৎকার কোর না!

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

অঘ্রাণের এক···

তোমারে যে ভালোবাসি
এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই,
জীবনের তীরে তীরে ভেড়াইনি কোন দিন
স্বপ্নের তরণী-খানি নিবিড় ভাবের ঘোরে,
কোনো দিন কোন এক অতন্দ্র প্রহরে
জ্বালাই নি দীপশিখা
ভুলি সব আঁধার ব্যথার গ্লানি
শুধু আজ, শুধু আজ, এই মধ্যাহ্ন প্রহরে
হে প্রিয়া আমার,
প্রেয়সী হৃদয় লীনা, স্বপ্নের
জাগর ক্ষণে
বাসিয়াছি ভালো,
যুগ যুগ সঞ্চিত সে
সাধনার কবোষ্ণ প্রলাপে
গাঢ় আলিংগনে তোমায় বাসিয়াছি ভালো।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সে কি শুধু হাওয়ার বদল ?

মহুয়া বা মুর্মু রমণী,
এ সব ছাড়া কি আমি
পাথর-ফাটানো শাল, মহিষ-রঙের নদী,
হাতে খোদা কাঁকই দেখি নি ?

কেন তবে ভিন্‌দেশে যাওয়া ?
সে কি শুধু নষ্ট রক্ত বমনের প্রাচীন অভ্যাসে
হাওয়ার বদল—
প্রতিশ্রুত মুক্তি কোন পাড়ে ?

ধাতব হত্যার শব্দ জেগে ওঠে পাহাড়ে পাহাড়ে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সঙ্গ-নিঃসঙ্গতার দিনলিপি

শরীর পেতেছি ধুলোয়
রেখেছি অহংকার
ওড়ে শীতের হাওয়ায় পাতা শুকনো পাতা শিশির ভেজা হলুদ পাতা
পড়ে উড়ে যায় পড়ে উড়ে যায়
শরীর ঢেকে যাচ্ছে ধুলোয় শুকনো পাতায় হিমে
ধুলোর তলে ধুলো
পাতার তলে পাতা
হিমের ভিতরে হিম হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছি···

ধুলো আমার ধুলো আমার ধুলো !
নাও ছড়িয়ে দাও শরীরময় হিমাক্ত ঘাস—
এই তো সকাল
সাদা নীরক্ত কুয়াশায় অন্তরীণ সকালবেলার পৃথিবী—
পাতা ঝরিয়ে শান্ত শীর্ণ আমলকি
মৃত্যুজড়িত ধূসর কাক
স্থির জলে এই সব জন্ম মৃত্যু এই সব আবহমান

এই সব মৌন ছিঁড়ে সশব্দে দৌড়ে গেল ভয়ার্ত ট্রেন
বাজে জাগরণ ক্যাথিড্রালের চূড়ায়
শীতের স্থির হাওয়ায় স্থবির কলকাতা তার সকাল তার পথ

মুখ ফাটে ছিটকে পড়ে হিমজড়ানো ধুলোয়
চোখ ভেসে যাচ্ছে
চুল উড়ছে উত্তুরে হাওয়ায়
দুটি পা-ই অপরিতৃপ্ত ভ্রাম্যমান
……ছড়িয়ে পড়ছে ক্লান্তি পৃথিবীময়
হৃদপিণ্ড ভাসছে স্থির কুয়াশায় হিমে
(ভাসমান নিস্পন্দ বিষাদ যেন)

দিন পুড়ছে ক্যাথিড্রালের চূড়ায়
দিন ঝরছে দীঘির কালো জলে
ছায়া পড়ছে পথে
ছায়া ভাঙছে স্থির জলে শব্দহীন
এইসব মৌন যাত্রা অবিরল অমোঘ চলে অন্তরালে

অস্ফুট সব পায়ের শব্দ শুকনো পাতা চূর্ণ করে চলে
আমি শরীর পাতি ধুলোয় পাতায় হিমে

এইসব মৌন ছিঁড়ে মিলিয়ে যায় সেই ভয়ার্ত ট্রেণ
অলক্ষ্য তুমির দিকে···অন্তরালে……

শান্তনু দাস

বকুল ফোটার বকুল ঝরার

ঘোড়ার ক্ষুরে উড়িয়ে নিল ঝড় :
অথচ নড়বড়
আমি
শেষ মাইলের ষ্টোন আঁকড়ে বসে আছি : চার প্রহরে,
ডাকবাক্সে অশ্রু জমে অমল।

কোথায় আছো
তোমরা কোথায়
সময় যেন স্যালাইন দেওয়া বোতল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায়
গড়িয়ে মেশে স্মৃতির ভারে চোদ্দ মুখের ঝাপসা ছবি
চার দেয়ালে।

এখন আমি চার দেয়ালে :
চার থেকে তিন, তিন থেকে চার
চোদ্দটা মুখ দরজা নাড়ে চৌপর রাত স্মৃতির পাহাড়
কান পাতলে আওয়াজ আসে দিঘীর পাড়ে কালবাউশের
বকুল ফোটার
বকুল ঝরার শব্দ শুনি ফাঁপড়া বুকে।

যারাই আসে দরজা পেরোয়, তাদের আমি
মুখ দেখিনা···
চোখ দেখিনা···
হৃদয় ছুঁতে বুকের দেয়াল, তফাৎ রাখে লক্ষ যোজন
যেন,
উজ্‌বুক এক দেহাত ছোকড়া শেষ আসামী
জংশনে যার লুট করেছে
আদ্যোপান্ত শেষ পারানি।

এখন আমি চার দেয়ালে :

চার থেকে তিন তিন থেকে চার
চোদ্দটা মুখ লটকে থাকে চৌপর রাত স্মৃতির পাহাড়,
শেষ মাইলের গারদ ছুঁয়ে বসে আছি।

বৃদ্ধ চোখে অশ্রু জমে অমল॥

পলাশ মিত্র

চিতা নির্বাপিত, চিতা বহ্নিমান্

এখন আর বন্ধুর জন্য কাঁদি না।
এখন আর বন্ধুর মুখে
ভালোবাসার স্বপ্ন দেখি না :
বন্ধুর জন্য এখন আর
নিঃশব্দ নিস্তব্ধ
সন্ধ্যাকাশকে মুখরিত করি না।

এখন ঘুমের মধ্যে সাপের স্বপ্ন দেখি।
সাপ এবং বন্ধু
বন্ধু এবং সাপ
এখন সবই একাকার।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

তিনটে কবিতা

এখন নিশান্ত নয়। রৌদ্রের সময়ে
পাখিটা ঝাপটাচ্ছে ডানা
খাঁচার ভিতর।
সূর্যমুখী, বজ্রপাত দ্যাখো,
আকাশ স্তব্ধতা ভাঙছে,
নিচে সাঁকো, নদীর মুকুর।

২
এখানে বেঁধেছি ঘর, বালুচরে, গোধূলির দেশে।
জ্যোৎস্নায় শরীর কাঁপে,
যেন সে অনন্ত রাত্রির হাহাকার।
কি জানি কেমন করে বেঁচে আছি বিনা ভালোবেসে ?
কেন যে আশ্রয়হীন সমস্ত সংসার ?

৩
তোমাকে ডেকেছি আমি, অন্ধকারে, জলের প্রপাতে।
তবু তুমি প্রশ্ন করো :
'কে আমাকে তীব্র ভালোবেসে।'
সেকথা জানি না আমি, অনন্ত প্রহরে
হয়তো সিন্ধুর ঢেউ তোমাকেই বুকে ধরে রাখে।

সুচেতা মিত্র

একটা গাছের নিচে

একটা গাছের নিচে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকব
আমার ভাবনার মধ্যে
অনেক কালের বিপর্যস্ত দিন
ধুলো সরিয়ে বসার চেষ্টা
তোমারই থাক।

দরজায় টোকা দিয়ে
আমাকে বিব্রত করার নেশা ছিল
আমি ঘরে ফেরার দিন রেখেছি সরিয়ে।

একটা গাছের নিচে চিরকাল আমি
দাঁড়িয়ে থাকব।

বীরেন মিত্র

কেন

বুদ্ধত্বের প্রথম আবাহন
'ভালোবাসো'।
খ্রীষ্টের আপ্রাণ শিক্ষা-
ভালোবাসো, ক্ষমা করো।
কৃষ্ণপ্রেম এগিয়েছে ধরণী বিজয়ে
হিপিরাও বলে চলেছে
'ভালোবাসা—যুদ্ধ নয়'।

মহামানব আর সামাজিক অস্পৃশ্যের ডাক যদি এক
কারা তবে করছে লড়াই—
কারা দায়ী
নাগাসাকি, ভিয়েৎনাম, বায়ফ্রার
জলন্ত তাণ্ডবের।

যে আগুন পাথর গালায়
কেন তা লাগানো-হোল মানুষের মাংস পোড়ানোতে
গোষ্ঠীর অনির্বাণ লালসায়
সমষ্টির শিক্ষা, সমাজ, সভ্যতার হোল অবসান
কেন, কেন, কেন—

অমল ভৌমিক

বাউল

কার তরে তুই উদাস হলি
বাউল মন রে
কারে আপন ভেবে আপনারে তুই
দিলি জলাঞ্জলি।

কে ওরে তোর কান্না শোনে
কে দেখে তোর চোখের জল
ও তোর ব্যথায়
কার বুক ফেটে যায় বল।

আকাশ থেকে সোনালি রোদ ঝরে
তোর ভাঙা মন যেন কেমন করে

ও তুই কার সোহাগে উদলা হলি
ধুলোর মধ্যে লুটিয়ে গেলি
কারে আপন ভেবে আপনারে তুই
দিলি জলাঞ্জলি।

অরুণাভ দাশগুপ্ত

ফিরে আসি

ফিরে আসি
জাতভিখারির চেয়ে কুশলী হাতের প্রান্তে
ছুঁয়ে নিতে উদ্ভিন্ন মমতা
নাকি
চাঁদমারি বিঁধে থাকা মায়াবী বিভ্রম ?
যেরকম টানে মগ্ন বেলাভূমি, মোহিনী বাতাস,
আড়ালে নিঃশব্দে ওৎ পেতে রাখে চোরা বালিয়াড়ি !

ফিরে আসি
মহাঅরণ্যের মতো বিশাল নির্জনে
দুঃখ মুছে নিয়ে, প্রার্থিত সজন
তোমাদের প্রশান্ত চাতালে
সুখ আছে ?
জানো, কতোটা উত্তাপে হু-হু করে বাড়ে সুখ
শমীগাছে স্ফুলিংগের মতো ?
না কি
নিহিত অসুখ
লক্ষ দ্রুততায় ব্যপ্ত রক্তের গভীরে
সজনে অপ্রেম, যার প্রলম্বিত ছায়া পড়ে বিশাল নির্জনে।

অমিত বসু

দাঁড়িপাল্লার রায়

যখন গলায় পরালে জয়ের মালা
চীৎকার ক'রে বলতে গেলাম শোনো :
আমি যে হারতে হারতে জিতে গিয়েছি
তোমরা কি তার খবর রাখো কোনো ?

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে সাতমহলার ছাদে
উঠেই পেলাম হাজার হাতের তালি
মেয়েরা তো সব আহ্লাদে আটখানা
বন্ধুরা মিলে পিঠ চাপড়াল খালি ;
আমার তখন হৃৎপিণ্ডটা গোটা
ধুলোয় কেবল লুটিয়ে পড়তে বাকি।

বার বার মুখ থুবড়ে পিছলে পড়ে
ঝরছে যখন রক্ত চোখের জল
শরীরটা গেছে ধনুকের মত বেঁকে
তোমাদের কেউ সে ছবি রাখলে এঁকে
দেখতে সেখানে পদে পদে পরাজয়,

অথচ আমার স্বর্ণপদক দেখে
আজ সকলেরই প্রবল ঈর্ষা হয় ;
আশ্রিত নই আশ্রয়দাতা ব'লে
ভিক্ষা করিনা ভরি ভিক্ষার ঝুলি
আজকে আমার ঘৃণা হ'ল সঞ্চয় ;
কেন মিছিমিছি মূর্ত্তি গড়তে গেলে
রাজপথে এঁকে রাখলে আমার নাম
নাটকীয়তায় দুঃখই শুধু পেলে
ক্ষুধিতেরা জানে কেবল রুটির দাম।

কুমারেশ চক্রবর্তী

আমিই তাজমহলের মালিক

সত্যি বলছি, চেষ্টা করেও একটা কবিতা এলো না কলমে।
শোনা মত, কাব্যের উপদেশ মত বারবার কান পেতেছি
তাজের সেই সাদা পাথরের কোনায় কোনায়,
কোন বোবাকান্না কিংবা প্রেমের বিলাপ
কিছুই পাইনি শুনতে।
ভরা দুপুরে দেখেছি সদ্যছাঁটা সবুজ ঘাসে বসে,
স্মৃতিসৌধের সামনে জলাধারে স্থির ছায়া দেখেছি,
দেখেছি পূর্ণিমা রাতে নিখুঁত গোল চাঁদের বন্যায়।
তবু ও না, একটিবারও ভাবাবেগ এলোনা মনে।

অথচ সত্যি বলছি, চেষ্টা না করেও কেন জানি না কেমন করে
তাজের প্রতিটি পাথরে তোমার মুখ দেখেছি
মমতাজের শীতল কবরে হাত রেখে তোমার হাতের স্পর্শ পেয়েছি,
পেয়েছি তোমার বুকের উত্তাপ।
ঠিক সেই মুহূর্তে নিজেকে হতভাগ্য শাজাহান না ভাবলেও
তাজ কে বড় আপনার মনে হচ্ছিল,
যেন আমিই তাজমহলের মালিক।

দীপক সরকার

এখন ক্রমশঃ প্রভু

এখন ক্রমশঃ বড়ো ক্লান্ত বোধ করি
দু'পাশে দীঘল ছায়া অবনত সমতলে ক্রমশঃ গড়ায়
বনতল অন্ধকার—দৃঢ় অন্ধকার। সময়ের বিশাল ভেলায়
লখীন্দর সতত শয়ান। বেহুলা কোথায়— ?

জাগতিক প্রক্ষেপ স-কাল বিলীন। ভিতরে বাইরে হেথা সমস্ত অর্গল বন্ধ।
জরায়ুর অন্ধকারে ভ্রূণের শরীর ভাঙ্গে দুর্বিনীত বয়স।
আত্মপরিজন, প্রভু, ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের মত বড়ো নির্মম চেয়ে থাকে,
করতলে
আয়ুরেখা নির্নিমেষ পোড়ে।

এখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ ক্রমশঃ
প্রভু, বড়ো ক্লান্ত বোধ করি।

রণজিৎ দেব

রৌদ্রের ভিখারী

গাভীন গরুর মতো নদীর ওলানে দুধ জমলে
একপাল মাদীমদ্দা বুনো জন্তুর ঝাঁপাঝাপি চৈতন্য
বিলুপ্ত হয় সময় সময়
আকাঙ্খাহীনতা
অর্থহীন শুকনো পাতার মতো উড়ে যাওয়া সোনালী
মদের দুর্নিবার লালসায় মেতে ওঠা
ছুঁয়ে দেখা মধ্যরাতে সিঁদুর-টিপ গৃহের সন্ধানে,
ধলেশ্বরী কত জল ধরে?
অবিরল আদরের মতো রৌদ্রের ভিখারী এসে ডুব দিলে
শ্বাসকষ্ট, অশ্রুমতী চোখে, পীড়িত ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে :
জীবন সম্পর্কে গালভরা ব্যাখ্যা চলে না, দধিচীর
মতো আত্মদান
স্বর্গ-নরক বলতে কোন কিছু জানতে চেয়োনা
গাভীন গরুর মতো নদীর
ওলানে যদি দুধ নামে।

জ্যোতিন ঘোষ

যাও ভেসে যাও দুঃখ সুখের মাঝদরিয়ায়

মাঝদরিয়ায় পাল তুলে দিয়ে নৌকোতে
দুঃখ সুখের মাঝদরিয়ায় যাও ভেসে যাও
দাঁড় বেয়ে যাও—যেও, বইঠা বেয়ে যাও
গুণ টেনে যাও তেমন তাপে ছইয়ের নীচে
দিবানিদ্রা দিও। যাও ভেসে যাও মাঝদরিয়ায়
দুঃখ সুখের মাঝদরিয়ায় পাল তুলে দিয়ে নৌকোতে

সাঁঝসকালে ভাটিয়াল গান গাইবে
হিজলবনে তুলবে যে তান শালিক সখীর সনে
আকাশ ভরা উঠলে তারা ঢেউ ভেঙ্গে ঢেউ
শৈশব খেলায় স্মৃতি ভেসে যাবে—
তেমন কর্মেতে মন নাই যদি বা খেদ কোন—
তেমন দুঃখে তেমন সুখে সমান ক্লান্তি সমান শান্তি
চাই যদি যাও মাঝদরিয়ায়
মোহানাতে একত্র শেষ সাগরপারে ছুটি।

অমিতাভ চক্রবর্তী

মুশায়ারা শেষে মন

মুশায়ারা শেষ হল যখন
তন্বী এক সুবেশা সুন্দরী
নিদ্রাতুর কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে,
"স্বর্গে ওঠার সিঁড়ি কোথায় ?"

ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় পলাতক মুখ
কাছে এসে হাত রাখে, ঠোঁটে ঠোঁট,
উজ্জ্বল ঝর্ণা ধারা উজ্জ্বল তরঙ্গ,
রঙ্গিনী নৃত্য-শেষে নীলাভ মদিরায়।

এখন দিগন্তে সবুজ সমারোহ,
গজলের সুরে সুরে সূর্য আলো-রেখা ;
ময়ূরী মেঘে মন আশ্বিন আবাহন,
স্বপ্ন সমুদ্রে স্মৃতির সুবর্ণ তরী।

রুদ্রেন্দু সরকার

জেনে রেখো ভাবী

খুবই নিঃসঙ্গ মনে হয়
যখন রাত্রি গড়িয়ে নামে নিচে
গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে অথর্ব সময়।
ভুঁইফোড় ঘাসগুলোকে মনে হয়
ওরা চুষে নিতে চায় সব রস।

আনাড়ী পাড়ায় গরুর গাড়ীর চাকা
কাদায় বসে গিয়ে জুড়েছে আওয়াজ
গাড়োয়ান মারছে চাবুক—
তবু বোকারাম বলদ
মরছে মাথা কুটে।

চারিদিকে ঘুটঘুটে বিক্ষুব্ধ রাত
আর প্রসূতির বিকট চিৎকার
তবু-জেনে রেখো ভাবী
ফোরসেপ্ ছাড়া শিশু জন্মাবেনা আর।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধা ভেঙে যায়

প্রায়ই তার সাথে দেখা হয়
কোন কথা হয়না,
সেও ব্যস্ত—শহরের বুকে ঘুরতে ঘুরতে
তার মুখ—ধুলোয়
আমিও ভুলে যাই।

সে এসেছিল, আমার ভেতরই এক সময়
কেউ ডেকে ওঠে
জাগরণ, স্তব্ধতা ভেঙে যখন দু'চোখ মেলি
শীতের সন্ধ্যায়
সেও আমার মতন বাড়ী ফেরে
তার গ্রীবায় বাঁকানো হাসি
আকাশের চাঁদ—
রাস্তার পাশে পুরোন ট্রাম লাইন
রক্ত মাখা চাকু,
আতঙ্কিত শহর খোঁজে নিরাপদ আশ্রয়।

বিশ্বনাথ ঘোষ

উদ্বাস্তু

সঠিক করে বলতে আমি পারব না
কোন গাঁয়েতে ছিল সে যে. কোথায় তার ঠিকানা ?
দিনরাত
রাতদিন
হাওয়ার পালকে ভেসে ভেসে
সে
একদিন স্রোত হয়ে মেঘ হয়ে
উড়ে এল
উড়ে এল
কান্নার ফসল চাপিয়ে পিঠে জোতজমা ফেলে
পা পা হাঁটি হাঁটি
কে জানে কোথায় তার।
সাত পুরুষের ভিটেমাটি!

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন

শিমুরালীর শান্তশীতল সুপ্ত-শ্যামল সন্ধ্যায় ;
সমুদ্র শঙ্খ আর শোনা হল না।
কারণ, রূপসী প্রেম ময়ূর এখন পাখা মেলে
রবীন্দ্র সরোবরে।

হলুদ নদী সবুজ বনের ধারে—
জ্যোৎস্নায় পুলকিত রূপালি আকাশ দেখা হল না ;
কারণ, পলাতকা হৃদয় এখন পালক খসায় মহাশূন্যে !

শংকর দাশগুপ্ত

তুমিই

তুমিই আমার সরলতা
করলে হরণ ছেলেবেলার
মেলার ভীড়ে হারিয়ে দিলে
আমার প্রিয় রাজার টুপি
তুমিই আমার ছেলেবেলার
একা দোক্কা দাগের ওপর
দাগ কাটলে বাঘবন্দীর
সঙ্গী দিলে চতুর নারী

নারীর হাতে ভীষণরকম
হারিয়ে দেয়ার কারসাজিটা

আমাকে তুমি শেখালেনা তো
তাই হারলাম তাদের হাতে
দৌড়ে দিয়ে ইষ্টিমারে
ইচ্ছে ছিল গঙ্গা-পাড়ির

ভুলিয়ে তুমি হাত ধরালে
ধুরন্ধর এক চতুর নারীর।

এখন আমি পথের ধুলোয়
আলোর ফ্ল্যাটে সেই সে নারী
এক্কা দোক্কা রাজার টুপি
এখনো ভাসে ধূসর চোখে

তুমিই আমার ইষ্টিমারে
গঙ্গাপাড়ির আসল খুনী
তুমিই সে যে আজকে আমায়
করেছো পথের জাত ভিখিরী।

শিশির ভট্টাচার্য

প্রিয়তম মুখগুলি

প্রিয়তম মুখগুলি একে একে স্মিত চলে যায়
পরাহ্ন রোদ্দুরে,
রামধনু বস্তুগুলি অভিরাম নষ্ট হয়ে যায়
চলোর্মি দিন জুড়ে,
ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলি দীর্ঘছায়া দূরতম হয়
অস্থির উচ্ছ্বাসে,
গাঢ়তম দুঃখগুলি তারা হয়ে উদাসীন ফোটে
একদিন বিষণ্ণ আকাশে।

ভারতীয় অন্য ভাষা

হিন্দী

স্বদেশ ভারতী

[ষাটের দশকের হিন্দীভাষী তরুণ কবি স্বদেশ ভারতী কলকাতায় থাকেন। ইনি 'রূপাম্বরা' নামে একখানি হিন্দী ও একখানি ইংরেজী কবিতা মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। স্বদেশ ভারতী একাধারে কবি, ছোট গল্প লেখক ও ঔপন্যাসিক। এঁর কবিতার মূল সুর— আধুনিক মানুষের জীবনের অসঙ্গতি ও গভীর মর্মযন্ত্রণা]

ক্ষুধা

ঈশ্বরের জন্মগ্রহণের দিন পেরিয়ে গেছে
ধর্মযোদ্ধাদের ক্রুশবিদ্ধ করোটির দৃশ্য
ভয়ঙ্কর মনে হয় না এখন আর—
হাজার বছরের প্রাচীন মৃত অস্থিকংকাল
যাদুঘরের শোভাবাড়ায় আজকাল—ব্যর্থ
শুকনো শাখায় বসে থাকা নরমাংসভুক পাখির ঝাঁক
দেখা যায় চারদিকে।

সাত সাগরের পারে
ক্রন্দসী শ্লোক
ডুবন্ত জাহাজের মাস্তুল
উমর খৈয়ামের ভাঙা পানপাত্র
ভগ্নাবশেষ মদিরালয়ের সিঁড়ি
এবং কপোতগ্রীবা যুবতীর সুঠাম চিক্কন উরুদ্বয়
যার ওপর হয়তো কখনো কামনার পানপাত্র উপচে পড়েছিল,

আর দৃঢ় উদ্ধত পীন পয়োধর
যেখানে সূর্যের সহস্র বর্ণালী একদা পদস্খলিত হয়ে
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছিল
এখন সেখানে—
কবরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা
শুধু কিছু কঙ্কালের অবশেষ যেন।

ক্ষুধার্ত বিভ্রান্ত গ্রাম্য কুকুর এক
হাড়ের টুকরোটা ধারালো দাঁতে নিয়ে
ঘুরে বেড়ায় জৈষ্ঠের ক্লান্ত দুপুরে।
বারবার তাড়াখেয়ে
অশথের রহস্যময় ছায়াটার নিচে
[দেবী ভবানীর উদ্দেশে ঢালা জলে
মাটির কিছুটা ভিজে রয়ে গেছে এখনো]
বসে এসে এবং থাবা দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে।
অপর থাবাটা দিয়ে হাড়ের টুকরোটা
চেপে ধরে চিবিয়ে চলে সে……
আর অলস পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে
শুয়ে পড়ে তারপর।

অনুবাদ—অজয় সান্যাল

আলি সর্দার জাফরী

[বম্বে নিবাসী আলি সর্দার জাফরী চল্লিশের দশকের বিখ্যাত উর্দুভাষী কবি। আফ্রো এশিয়ান মৈত্রী বন্ধন ও শান্তি আন্দোলনের একজন পুরোধা হিসেবে সত্য ও সৌন্দর্যের উপাসক কবি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন]

আগুনের পোশাক

কে দাঁড়িয়ে রয়েছে আগুনের পোশাক পরে ?
শরীর যার চূর্ণ, মাথা থেকে রক্ত বয়ে যায়
বহু দিন হয়েছে, ফরহাদ ও কৈস শেষ হয়ে গেছে ;
তাহলে এ কার ওপর পাথর মারার আদেশ ?
এখানে তো কারু শীরীনের সৌন্দর্য নেই !
এখানে তো কেউ লৈলার মতো বসন্ত বদন নয় !
তাহলে কার নামে এই ফুলের মতো ক্ষতের কারচুপী ?
বোধহয় কোনো পাগল এখনও সত্যের নাম জপে,
ধোঁকা এবং মিথ্যাকে এখনও প্রণাম করতে অপ্রস্তুত,
পরিষ্কার তারই শাস্তি—পাথর মেরে অবসান করো তার।

অনুবাদ—আবু আসাদ মহম্মদ ওবাইদুল গণি

নাজির হালমী

[ষাটের দশকের তরুণ উর্দু কবি নাজির হালমী সাম্প্রতিক কালের উর্দু কাব্য-সাহিত্যে বিশেষ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন]

তুমিও হয়তো

তুমিও হয়তো দেখেছো
ফুলের নিচে গোপন কাঁটা
চাঁদের মুখে কলঙ্ক
সূর্যের বুকে আগ্নেয়গিরি
পৃথিবীর আঁচলে রক্ত
ধনীর চোখে বিদ্যুৎ
সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাসে তুফান
বর্ণালীর কোলে অগ্নিশিখা
কাজলের মুখে কালি
হীরকের অন্তরে প্রস্তর
তাজমহলের হৃদয়ে সমাধি
জীবনের ছায়ায় মৃত্যু
যেন এ সব কিছুই নয়
দিন যেন রাত্রির হত্যাকারী নয়।

অনুবাদ—আবু আসাদ মহম্মদ ওবাইদুল গণি

অমৃতা প্রীতম

[সাম্প্রতিক পাঞ্জাবী সাহিত্যে শ্রীমতী অমৃতা প্রীতম একটি অতি পরিচিত নাম। জন্ম ১৯১৯ সালে। এ পর্যন্ত ১৪ খানি কাব্যগ্রন্থ ও কয়েকটি ছোটগল্প এবং উপন্যাস রচনা করেছেন। ১৯৫৩ সালে সুনেহরা কাব্যগ্রন্থের জন্য এঁকে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার দেওয়া হয়। ইনি দিল্লী থেকে 'নাগমনি' নামে একটি পাঞ্জাবী মাসিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন]

শহর

আমার শহর এক দীর্ঘ বিবাদের মতন,
রাস্তাগুলো অনর্গল তর্কের মতন,
আর গলিগুলো এমন,
যেন একই কথাকে কেউ এদিকে টানে কেউ ওদিকে টানে,
প্রত্যেক বাড়ী যেন এক এক বদ্ধ মুষ্টির মত,
দেয়াল ক্রোধে বিকৃত মুখের মত,
আর নর্দ্দমাগুলো যেন মুখ থেকে ঝরে পড়া ফেনা।
এই বিবাদ হয়ত সূর্য থেকে সুরু হয়
বেড়ে ওঠে আরও ওকে দেখে
প্রত্যেক দরজার মুখ থেকে আবার সাইকেল আর স্কুটারের চাকাগুলো
গালির মতন বেরুচ্ছে।
আর ঘণ্টা ও হর্ণ পরস্পরের ওপর গর্জাচ্ছে।
যে কোন শিশু এই শহরে জন্মায়,
শুধোয় যে কি নিয়ে এই বিবাদ?
আবার তার প্রশ্নও এক বিবাদ হয়ে দাঁড়ায়,
বিবাদ থেকে বেরিয়ে বিবাদে মিশে যায়;
শাঁখ ঘণ্টার শ্বাস রুদ্ধ
রাত আসে, মাথা ঘামিয়ে চলে যায়,
কিন্তু ঘুমের মধ্যেও এই বিবাদ শেষ হয় না,
আমার সহর এক দীর্ঘ বিবাদের মতন।

পাঞ্জাবী থেকে বাংলায় অনুবাদ—অমর ভারতী

ইংরেজী

প্রীতীশ নন্দী

[সাম্প্রতিক কালে যে অল্প কয়েকজন ভারতীয় কবি ইংরেজী ভাষায় কবিতা রচনা করে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন ষাটের দশকের তরুণ কবি প্রীতীশ নন্দীর আসন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক কবিতা পত্রিকা dialogue Calcutta-র সম্পাদক প্রীতীশ চারখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। New Rivers Press, New york, U. S. A, থেকে প্রকাশিত তাঁর From the Outer Bank of Brahmaputra কাব্য থেকে তিনটি কবিতার অনুবাদ নিচে দেওয়া হল]

১

কি আশ্চর্য সরব হাসি
অসংখ্য আগুনের মতো
তোমার কাঁধের ওপর
ভেঙে ভেঙে পড়ে
সমুদ্র
পেরিয়ে
অনেক
অনেক
ধানখেত ছাড়িয়ে

কি আশ্চর্য ছায়াগুলি
অন্নকণায় ভেঙে
তোমার
অশ্রু
সিক্ত
মুখ মণ্ডল

থেকে
দাবদাহ
মুছে
দিয়ে
যায়।

২

জিভের
সঙ্গে জড়িয়ে
যাওয়া জলের অপচ্ছায়া
বেলা
ভূমিতে
ভস্ম
রাশি
পর্বদিনের
হতাশা
শিকড়বিহীন শর্তাবলী
খুঁজে বেড়ায়।

৩

স্মৃতির পটে
সৌর স্পন্দন ছাড়িয়ে
শ্যাওলা—
ভাঙা
আলোয়
আঁধারের
প্রতিটি
যবনিকার
পেছনেই
থাকে
কঠোর
নির্বাসন

অনুবাদ—শিশির ভট্টাচার্য

বিদেশী ভাষা

ফরাসী (সেনেগাল)

লেওপোল্ড সেডার সেংঘর (Leópold Sedar Sénghor)

[আফ্রিকা মহাদেশে স্বাধীন সেনেগাল রাষ্ট্রের প্রথম এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি লেওপোল্ড সেডার সেংঘর ১৯০৬ খৃঃ তৎকালীন পর্তুগীজ অধিকৃত সেনেগালের Joal সহরে জন্মগ্রহণ করেন। একাধারে একজন রাজনৈতিক নেতা ও বিখ্যাত কবি তিনি। ১৯০৭ খৃঃ বেলজিয়ামের মেইজঁ দু পোয়েত্ (Maison du Poete) কর্তৃক আন্তর্জাতিক কাব্য পুরস্কারে সম্মানিত হন। সেংঘর ফরাসীভাষায় কবিতা লেখেন।]

সারাটা দিন ধরে

সারাটা দিন ধরে দীর্ঘ ঋজু রেলপথের ওপর দিয়ে
অন্তহীন বালুকার ওপর অনড় সংকল্পের মতো
শুকনো কায়োর ও বাওল পেরিয়ে
যেখানে বাবলা গাছগুলো যন্ত্রণায় হাত মোচড়ায়—

সারাটা দিন ধরে রেলপথের দুধারে
পরিচিত ছোট ছোট একই ষ্টেশনগুলির পাশ দিয়ে
যেখানে কালোমেয়েরা স্কুলের গেটে
পাখিদের মতো কোলাহল করে—

সারাটা দিন ধরে লৌহ ট্রেনের ঝাঁকানিতে ব্যথিত
ধূলিমাখা শরীরে কর্কশ স্বরে
সীনের চারণ ভূমিতে ইউরোপকে ভুলবার চেষ্টায় রত আমি,
—আমায় দেখ !

অনুবাদ—লীলা রায়

ফরাসী (ফ্রান্স)

মিশেল বনে দারমেজ (Michelle Bonnet Darmais)

[ষাটের দশকের তরুণী মহিলা ফরাসী কবি মিশেল বনে দারমেজ এর জন্ম লিয়ঁ সহরে। ইনি রোমান্টিক কবি। নিসর্গ চেতনা এঁর কবিতার একটি মূল সুর। ইনি বাংলাভাষা শিক্ষা করছেন]

সন্ধ্যার শিশিরের মতো

সন্ধ্যার শিশিরের মতো অন্ধকার পৃথিবীতে নামে
ক্ষেত ও গাছের মাঝে—
কল্পনার ঘাস আর গাছের মতোই আঁধার বেড়ে ওঠে
কারণ পৃথিবী স্বপ্ন দেখতে চায়।
হৃদয় ও শরীর যেন অজস্র ছিদ্রপথে
দৃশ্যপটের আর্দ্র অন্ধকারে এক হয়ে মেশে।
যে অন্ধকার দিকচক্রবালের বিপ্রতীপে আসন্ন রাত্রির সাক্ষাতের
প্রতিশ্রুতি জানাবার জন্যে দ্রুত রওনা হয়ে গেছে।

বৃষ্টির মতো, সকলেই, সবকিছুই
বিন্দু বিন্দু অন্ধকার হয়ে রাত্রির প্রেমে পড়ে
তীব্রবেগে নেমে আসে
আর বৃষ্টির মতোই
অন্ধকারের প্রতিটি বিন্দু
রাত্রিতে এসে পৌঁছানোর পর
তার চুম্বনে বিলীন হয়ে যায়···

তারাদের দেখ,
ওরা কেমন অন্ধকারের চোখের মণি হয়ে
রাত্রির ভেতর থেকে জন্মেছে,
আকাশের চোখের পাতা হয়েই যেন
নেমেছে অন্ধকার।

চাঁদের চারদিকে প্রহরীর মতো বসে আছে আঁধার—

অরণ্যের আহরিত শাখাগুলি কালো নারীদের মতো
অগ্নির উত্তাপ থেকে কমলা ফলের জন্ম দেয়।

চাঁদের চারদিকে অন্ধকার বসে আছে,
কমলা লেবু গাছের শাখা ও পাতাগুলির মতই
যেন তার ফলটিকে দোলা দিচ্ছে।

—কবি অনুদিত

ফরাসী (ফ্রান্স)

জাক্ দুপ্যাঁ (Jacues Dupin)

[তরুণ ফরাসী কবি ও সমালোচক জাক্ দুপ্যাঁ (Jacues Dupin) এর জন্ম ১৯২৭ খৃঃ। ইনি বর্ণাঢ্য উপমা ব্যবহার করে মোটামুটি ক্লাসিকাল ঢংয়ে কবিতা লেখেন]

মিশর তরুণী

তুমি যেখানে ডুব দাও
অতলতা অগভীর হয়
আমি কেবল নিঃশ্বাসটুকু তোমার,
ভরে দিই বাঁশীতে।
মরুভূমির মাঝে একটি বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে
আমার পায়ের নিচে।
সব কিছু শেষ হয়ে যায় একটি আঘাতে
অদৃশ্য হয় সবই।
থেকে যায় চিহ্নিত দরজা শুধু আমার,
চণ্ডালের হাতে।

অনুবাদ—বীরেন মিত্র

কবিতার মত গল্প

★ অন্যদিন মূলত কবিতা পত্রিকা হলেও এবার থেকে প্রতি সংখ্যায় আমরা কাব্যধর্মী অথবা কবিতার মতো স্বাদের একটি করে পরীক্ষা-মূলক ছোটগল্প পত্রস্থ করছি। এ সম্বন্ধে পাঠক সাধারণের মতামত আমন্ত্রণ করা হল—সম্পাদক

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি

জীবন সরকার

বাড়ী দুটো পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও দু বাড়ীর ভেতর যাতায়াত ছিল না। ফলতঃ মাঝখানে সবুজ লনের পাশে যে রাস্তাটা, তা সর্বদাই আবর্জনাময়। আন্তরিকতার হাত নিয়ে এগিয়ে এসে কেউ পরিষ্কার করতো না। ভেবেই পাওয়া যায় না পূর্বাপর এখানে যাঁরা বাস করেছেন কি ভাবে তাঁদের দিনরাত্রি শেষ হয়েছে।

এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীর জানালা দেখা যায়। ও বাড়ীর জানালায় পর্দার রঙ পলাশের মত লাল। অথচ এ বাড়ীর দরজা জানালায় কোন পর্দার বালাই নেই। শিবু বলে—"হাওয়া চাই। মুক্ত হাওয়া। সেই হাওয়া হু হু করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—সুখ—স্মৃতি। কেননা আমি নিজের সুখ চাই না। আমি বিশ্বাস করি ক্রমে ক্রমে সারা আকাশের মেঘ সরে যাবে।

পরিষ্কার নীল-ঘন-নীল নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে দেখা যাবে। কেননা খণ্ড-বিখণ্ড বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত আলো ছায়াময় ধরিত্রী গোলাপের সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছবে একদিন আর তখুনি কোন এক আশ্চর্য ছবি—আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, দুলে উঠবে। অবিরত দুলতে থাকবে।"

ভয়ে জড়সড় শিবু। না পারবে উঠে জানালাটা বন্ধ করতে। না পারবে কাউকে ডাকতে। একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরময় লুকোচুরি খেলে বেড়াবে হয়তো……

সেদিন অঝোরে বৃষ্টি। ধুলো ভরা বাড়ীর দেওয়াল জলের ধারায় একদম ফুটফুটে ফর্সা। শিবু দুরায়ত বৃষ্টির মধ্যে ইচ্ছার ফসল অনুসন্ধান করে। কারণ সে মাঝখানের ফাঁকটা অতিক্রম করে যেতে চায়।

মোহময় বাড়ীটার অন্দর মহলে রূপোর কাঠি সোনার কাঠি কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই লুকোন আছে। আর এমনি এক বৃষ্টি বাদলের রাতেই তা খুঁজে বের করতে হবে। বস্তুতঃ সেই কাঠির ছোঁয়ায়ই প্রান্তরে ধান ফলবে। শিবুর দৃঢ় প্রত্যয়, এই সোহাগ মুখর ঘর সংসারে তেমন পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান নেই। তাই চড়ুই পাখিরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় চতুর্দিকে। পেট ভরে না ওদের। তাই কার্নিশে ছাদে-জানালায় সর্বদাই কিচির মিচির। দুঃখ হয়—ভারি দুঃখ হয় তার।

ভাবনার অন্ত নেই শিবুর। অথচ ও জানে ঘূর্ণায়মান এই মঞ্চে অন্ধকারের ক্লোজ আপ,—মারাত্মক শট্। তারপর ফ্ল্যাশ। আলোর ঝলকানি। তেমনি সামনের বাড়ীটার উজ্জ্বল রঙ একদা—একদিন আর থাকবে না কিংবা বলা যায় আরো উজ্জ্বলতর হবে। এখানে এই হাওয়ায় সব—সবকিছুই সম্ভব। বির্বতনের মধ্যদিয়ে কুয়াশার জাল ক্রমে, ক্রমাগত দূরে, আরো দূরে সরে যাবে, হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক।

শিবু ভাবে—আচ্ছা ওবাড়ীর ওদের কোন কিছুর কি দরকার হয় না! তেল, নুন এইসব। বাজারে যায় কখন! কে যায়! সেই রাজকন্যে! যে নাকি সোনার কাঠি রূপোর কাঠি আঁচলে বেঁধে রেখেছে। শিবুর কাছে সে—সে এক বিস্ময়!

শিবু ভাবে, যেমন করেই হোক ওই লাল পর্দাঘেরা বাড়ীটার সদর দরজায় পৌঁছতেই হবে। অথবা খুঁজে বের করতে হবে কোন গোপন দরজা। আর সেই বন্ধ দরজাটা ভাঙতে পারলেই দেখতে পাওয়া যাবে তার ইপ্সিত সমস্ত কিছু। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করে শিবু—"বৃষ্টি, তুমি খালবিল উজাড় করে তুফান বেগে ছুটে এসো। আমি তোমার সংগে ঐ নিষিদ্ধ দরজায় আঘাত হানবো।

রৌদ্র, তুমি সারা আকাশ নিয়ে নেমে এসো আমি ঐ বন্ধ দরজায় আঘাত হানবো।"

নাঃ, ভাবতে পারে না শিবু আর। কোন কথাও বলতে পারে না। তার জানালা দিয়ে দেখতে পায় একদা কেয়ারি করা সবুজ লনটায় আজ কি আবর্জনা। সেখানে চড়ুই পাখিগুলি কি রকম অসহায় ভাবে তাকায়—যেন কতকাল খেতে পায়নি। আহারে! কি কষ্ট ওদের। অথচ ঐ বাড়ীটার মধ্যেই তো সেই সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি দুটো রয়েছে। বের করে আনতে পারলেই সব-কিছুর সমাধান হয়ে যাবে। অবিশ্যি বের করে আনাটা যে খুব সোজা কথা তা নয়। কিন্তু বাবুই পাখিরা একদিনে বাসা তৈরী করে না, একটু একটু করে দীর্ঘ সময় নেয়, তবেই তো ঘর। যে ঘর ঝড় তুফানেও ছিঁড়তে পারে না। বৃষ্টিতে রোদে নষ্ট করতে পারে না। কারিগরি দক্ষতা—কি নিপুণ! শিবু—বোঝে না যে তা নয় তবে—ঠিক সেই রকমই একটা কিছু গড়তে চায়। কিন্তু সেই দক্ষতা কি করে অর্জন করবে সে! হয়তো বা ঐ পলাশ লাল পর্দাঘেরা বাড়ীটার মধ্যে যে রাজকন্যে আছে—সেই বলতে পারবে।

পাশে রাখা ক্রাচের দিকে তাকিয়ে ভাবে শিবু। এই সব ভাবনা ওকে দিশাহারা করে দেয়। কিছু না থাকার, কিছু না পাওয়ার যন্ত্রণাটা বুকের মধ্যে পাগলা কুকুরের মত চীৎকার করে ওঠে হঠাৎ। তৃষ্ণার্ত চোখে চারদিকে তাকিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাটটা দেখে। দেওয়ালে টাঙানো রঙীন ছবিখানা দেখে। কিনারে রাখা বুক সেলফে স্তরে স্তরে সাজানো বইগুলো দেখে। ওর কাছে ক্যালেণ্ডারের তারিখগুলো ধোঁয়াটে ধূসর বা বিবর্ণ নয়।

শিবুর ঘরে কেউ একটা প্রায় আসে না। আসে সকল বেলায় চা। দুপুর বেলায় ভাত। আর রাতে দুধ-রুটি। এর কোন হেরফের নেই। নিয়মে বাঁধা। সামনের ঐ বাড়ীটার মত নয়। কোনদিন ওদের জানালা দরজা খোলা দেখল না শিবু। কোনদিন মানুষ দেখল না ঐ জানালায়। শুধু পলাশ লাল পর্দাটায় হাওয়ার তরঙ্গই দেখল।

এই সব লুডোখেলা পাশাখেলা ভাল লাগে না শিবুর। কি হবে ছক্কা ফেলে। ঘুরে ফিরে নীল-লাল ঘর পেরিয়ে যে জায়গায় ছিল—সেই জায়গায়ই ফিরে যাওয়া। এসব যে জানে না সে তা নয়। জেনেশুনে সকলেই যা করে তাই করে যেতে হয়! কিন্তু আর সহ্য করতে পারছে না সে। সেই সকাল—সেই সন্ধ্যা, যা কিনা মনে হয়—সে অনেক, অনেকদিন আগেই পেরিয়ে এসেছে।

শিবু জানে একদিন ঐ বাড়ীটা আর নীরব থাকবে না। চড়ুই পাখিরা, বাবুই পাখিরা সকলে মিলে তৈরী করবে এক নীড়। সুখের জন্যও হতে পারে। দুঃখের জন্যও হতে পারে। কিন্তু কি হবে না হবে ভেবে আর চুপচাপ থাকা যায় না। কেননা ঐ বিরাট বাড়ীটার ভেতর একলা সেই রাজকন্যেই শুধু বাস করবে তা হয় না—হতে পারে না।

শিবু নিজের ঘরের দিকেই আবার চোখ ফেরায়। সেখানে শূন্যতা—নিবিড় শূন্যতা। বাড়ীতে যে লোকজন নেই তা নয়। মা ছাড়া আর সকলেই রয়েছে। কিন্তু স্নেহ-প্রীতি প্রেম, দেওয়া নেওয়ার আন্তরিক সম্পর্কগুলি কবে যেন, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখন সেসব আবার ফিরে পেতে চাইলে হয়তো পারে সে কিন্তু কেবল সেই সোনার কাঠি রুপোর কাঠির ছোঁয়াতেই। তা সে কি ভাবে সংগ্রহ করবে তবে? শিবুর মাথার মধ্যে কেবলি সেই চিন্তা খুরপাক খায়। জানালার আকাশে কয়েকটা ঘুড়ি কি সুন্দর ভাবে খেলে—খেলে বেড়ায়।

শিবু নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না। ক্রাচটা নিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপে তার। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না সে। আর তখনই সেই রাজকন্যের কথা—আরো বেশী করে মনে পড়ে তার। তার সোনার কাঠিটা ছোঁয়ালে নিশ্চয়ই শিবুর ছোট পাটা অন্যটার সমান হয়ে যাবে। আর তা হলেই তো রোদে বৃষ্টিতে ধানক্ষেতে সে ইচ্ছের ফসল ফলাতে পারবে।

এমনি—এক দুপুরবেলা ঝলমলে রোদের দিনে অঝোরে বৃষ্টি নামল। কোথা থেকে ছুটে এল মেঘ। কালো হয়ে গেল আকাশ। কোথায় যেন দারুণ শব্দ করে বাজ পড়ল। বিদ্যুৎ চমকাল। মনে হল পাশাপাশি দুটো বাড়ী যেন ভীষণ সংঘর্ষে চুরমার হয়ে গেল। ভাঙ্গলে মন্দ হয় না কিন্তু। আসলে শিবু তাইই চায়। সেই জমিতেই তো তৈরী হবে আবার নতুন বাড়ী। তার ইচ্ছের নতুন ফসল। একটানা গরগর শব্দ উত্তর থেকে পশ্চিমে এল—গেল। জানালা দিয়ে দমকা বৃষ্টির ছাট এসে ঢুকছে। ঘরে এলোমেলো হাওয়ার ছুটোছুটি। এই মাঝ আশ্বিনে বৃষ্টিটা এত প্রবল জোরে এল। তবে কি সামনেই সেই চূড়ান্ত সময়! শিবু ক্রাচটা হাতে নিল। ধীরে ধীরে, খুব সাবধানে নিচে নামতে লাগল। কেউ কোথাও নেই। কেউ বাধা দিল না।

দরজা খুলে সবুজ লনের রাস্তাটায় নামলেই সামনে সেই পলাশ লাল পর্দাঘেরা বাড়ীটা। কি জোর বৃষ্টি! মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক। জামা-কাপড়

ভিজে একসা। হাওয়া যেন উড়িয়ে নিতে চাইছে। বৃষ্টির বাণ ডেকেছে যেন, প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল আবার। চারপাশে গম-গম আওয়াজ। পলাশ লাল পর্দাঘেরা বাড়ীটা তোলপাড়। থরথর করে কেঁপে উঠল সমস্ত পৃথিবী। চার পাশে গমগম আওয়াজ···গমগম আওয়াজ···গ ম গ ম আ ও য়া জ··· চারপাশে···প লা শ লা ল···

* * *

অতিকষ্টে রাস্তাটা পার হল শিবু। দিনের বেলা যেন রাত হয়ে গেছে। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুতের ঝিলিকের আলোয় চোখ ঝলসে গেল। সেই আলোয় বাড়ীটার গায়ে কোন রকমে হাত রাখল সে। তারপর হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে দরজার কাছাকাছি জায়গায় এসে হোঁচট খেয়ে সশব্দে পড়ে গেল।

সহসা শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল—মানে ভেঙে গেল। ঝুর ঝুর করে একরাশ বালি চুন ইটের টুকরো পড়ল। আর—তক্ষুণি হাওয়া আর বৃষ্টি একই সংগে হু—হু করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

অলঙ্কৃত হৃদয়/যন্ত্রণা

আলোচনা পর্যায়ে দু'টো কাব্যগ্রন্থ হাতে এলো। দ্বিমুখী, ভিন্ন স্বাদ। একদিকে রক্তাক্ত যন্ত্রণা, ধূমায়িত বিক্ষোভ, রাজনৈতিক পটভূমি। অপরদিকে প্রেম-ভাবনা ও বিষাদের হৃদয়-উৎসারিত উচ্চারণ। দুই বিপরীতধর্মী সড়ক বেয়ে দুই কবির পদযাত্রা। ইদানীং বাংলা কবিতায় সমান্তরাল প্রবাহিত পাশাপাশি ধারা দু'টো চিহ্নিতকরণের জন্যে সম্পাদকের গ্রন্থ নির্বাচন সময়োপযোগী এবং সুনির্বাচিত।

: আধুনিক কবিতার সমালোচনা করতে গিয়ে লরেন্স ডুরেল একটি চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন। কথাটি হ'ল—Poets must develop and grow if they are real. Poets and not hacks. আজকের কবিযশোপ্রার্থীরা অনেকেই এই সত্যি কথাটা ভুলে যাচ্ছেন ফলে সৎ কবিতা হওয়ার বদলে কবিতার এন্তার Production হচ্ছে। অথচ কত দীর্ঘ সময়ে এক একটি করে কবিতা কুঁড়ি হয়, ফুল হয়ে ফোটে। কবি তাঁর আশ্চর্য চাবিকাঠি দিয়ে এক অনির্বচনীয় জগতের দরোজা আমাদের সামনে খুলে ধরেন, তাই কখনো আমরা ফুলেই আগুন দেখি, আগুনে ফুল। কখনো সমুদ্র হয় আকাশ, আকাশ সমুদ্র। তাই যে কোনো অনুভূতি কিংবা যন্ত্রণা তা যৌনই হোক, প্রেমই হোক কিংবা হোক না জীবন-কেন্দ্রিক, তা ভিত্তি করেই তো এই সুকুমার শিল্প হয়ে ওঠে সর্বজনীন। এটাই তো মূল কথা যে কবির আত্মসমীক্ষা হবে এক থেকে বহুতে। কবির রচনার ধারা পরিবর্তিত হয়, হতে পারে, কিন্তু মূল বিন্দু থেকে তিনি কখনোই বিচ্যুত হবেন না এ আশাই করতে পারি। বরঞ্চ ঐতিহ্যের সঙ্গে সমসাময়িক কালের সমীকরণে মণিকাঞ্চন যোগ হবে।

: অত্যন্ত দুঃখ হয় যখন দেখি এই বিশ্বাসের সোপানে দাঁড়িয়ে কল্লোল থেকে

কল্লোলোত্তর চল্লিশের কবিরা যখন এক একজন শানিত তলোয়ারের মত ঝলসে উঠেছেন তখন তৎপরবর্তী পঞ্চাশের কবিকুল (সংখ্যায় চারগুণ বেশী হয়েও) তাঁদের ব্যক্তিগত বেদনা, নারী সঙ্গ-লিপ্সা, যৌন-যন্ত্রণা, সুখ দুঃখ প্রেমকে আত্ম-কেন্দ্রিক করে ধুন্দুমার দামামা বাজিয়ে এখন কেমন জলঢোঁরা সাপের মত নির্বিষ হয়ে আছেন। তৎপরবর্তিকালের কবিরা এখন আর তাঁদের চিনছেন না, চিনলেও Recognize করছেন না, Recognize যদিও বা করেন কিন্তু Importance ? নৈব নৈব চ। অবস্থাটা ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখন হাতের আঙুলের কর গুনে গুনে দুচারজনকে পুরোভাগে মাত্র রাখা যায়। আর এই দুচারজনকে বাদ দিলে গোটা পঞ্চাশই তো একটা পোড়ো জমি, এলিয়টের কবিতার একটা ইমেজের কথা মনে করিয়ে দেয়—'Here is no water but only rock/Rock and no water...। এই ব্যর্থতার কথা ভাবা যায় না। তবু আশার কথা, এই মহাশ্মশানে মাটের কবিরা তান্ত্রিকের মতো শবসাধনা করে চলেছেন।

ঃ অনুভবের এই তুঙ্গে উঠেও কবি নৈরাশ্যপীড়িত এবং নিঃসঙ্গ হতে পারেন। তবু একটা আশা থাকে এই তমিস্র অন্ধকারে কখন বটের ঝুরির মতো রক্তিম সকাল ঝুলে পড়বে। তাই এই গাঢ় অন্ধকারে বুঝি কবিই আলোর মশাল জেলে বলতে পারেন—'He who sees my father sees me'। এক উর্দু কবি বলেছিলেন—'পহলে শরাব জিস্ত থি, অব জিস্ত হ্যায় শরাব' মানে, আগে জীবন সুরায় ডুবেছিল আর এখন জীবন হয়েছে সেই সুরা। অর্থাৎ জীবন-দর্পণে কবি কত মায়াজাল সৃষ্টি করতে পারেন যাতে প্রতিবিম্বিত হয় তামাম দুনিয়ার মুখের আদল। এক আয়নায় হাজার অবয়ব, চলচ্চিত্রের মতো একটার পর একটা ছবি আসে, দূরে সরে যায়।

ঃ সাম্প্রতিক প্রকাশিত দুটো কাব্যগ্রন্থ আলোচনা করতে গিয়ে এটুকু গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন ছিল।

চল্লিশের পুরোধা কবি মণীন্দ্র রায়ের অতি-সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'জামায় রক্তের দাগ' ও সতীকান্ত গুহের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলোর পাহাড়ে'র মূল সুরের মধ্যে আদ্যোপান্ত ফারাক থাকলেও দুই কবিই আশাবাদী। নানা ঘাত প্রতিঘাত, বিবর্তন, অস্থিরতার মধ্যেও তাঁরা ভোরের স্বপ্ন দেখতে চেয়েছেন। মনীন্দ্র রায় যখন বলেন—'প্রতিদিন বেঁচে বেঁচে কাঁটা থেকে ফুল / আমার জীবন।' তখন বিশ্বাসের আরেক মেরুতে দাঁড়িয়ে সতীকান্ত গুহ গভীর আত্মপ্রত্যয়ে বলছেন

—'একদিন কারো যাত্রা শেষ হবে,/দেখবে সে মুখোমুখি দৃপ্ত স্থির আলোর পাহাড়।'

অ্যাকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত কবি মনীন্দ্র রায়কে পাঠকের কাছে নতুন করে চিনিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাহলে আরও কিছু পেছু হটতে হয় কিন্তু সম্পাদক নির্দেশিত অল্প পরিসরে সে আলোচনা সম্ভব নয়।

আমার মনে হয়েছে বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের পরে 'জামায় রক্তের দাগে' কবি নতুন ভাবে একটা বাঁক নিয়েছেন। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কবি গোড়া থেকেই সমাজ-সচেতন। ফলে তাঁর কবিতায় মাটির গন্ধ, জন্মভূমি, মানুষের প্রতি গভীর মমত্ব বোধ, প্রতিবাদ, সব কিছুর ভেতরেই একটি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু মন কাজ করে।

যে যুগে আমরা বাস করছি সেখানে প্রতিদিনকার হতাশা, বিক্ষোভ, জীবন সম্বন্ধে অনীহা ইত্যাদি আমাদের চারপাশের আকাশে যে একটি তীব্র ধূম্রজালের সৃষ্টি করছে, কখনো সখনো তা বিদ্যুতের চাবুকের মতো ঝলসে ওঠে। এই সমাজবিবর্তন থেকে কবি কখনোই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন না। জনতার মাঝেই কবি তাঁর মুখের আদল চিনে নিতে পারেন। এক···এক থেকে বহু। কি নাম তার ? ঠিকানা কোথায় ? কবির জানা নেই, কিন্তু কবি তাকে জানেন, তার যন্ত্রণায় শরিক হয়ে বলতে পারেন—'জানি না কি নামে তুমি / কলকাতায়, নাকি দুর্গাপুরে / তরাইয়ে, না মেদিনীপুরের / কোন মাটি গায়ে মেখে, জন্ম নিয়ে, আজ / কোন স্বপ্নে চলেছ কোথায় ? / জানলার এপারে আমি বিগত রাত্রির / অন্ধকার বুকে নিয়ে জাগি নিরুপায়।' কবি জানেন—কোন অশ্রু এমন পাথর। তাঁর কবিতা কখনো যুগধর্মীতা পরিহার করে না। পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার পট পরিবর্তন কবিতাকে পুরনো, মর্চে ধরায় না। তাই যন্ত্রণা কখনো সোচ্চার, কখনো তীর্যক কিন্তু সবক্ষেত্রেই কবি শরিক—'দুহাত পেরেক তাই ? / দুপায়ে পেরেক ? / আর্ততীক্ষ্ণ চেতনায় এ জীবন তাই / ক্রুশে বেঁধা পেরেক আমার।' একদিকে যখন এই রক্তাক্ত যন্ত্রণা অপরদিকে সুবিধাবাদী মানুষগুলোর চেহারাও অস্পষ্ট থাকে না। রুদ্র সময় জঞ্জাল সাফসুতরো করে এদের কাল-গর্ভে ছুঁড়ে ফেলে। কবি দেখেন—'আমি কিন্তু দেখি সবই বাঁক নেয়, নড়ে টাল খায়, / কুটিলা নদীর মতো জলমগ্ন লুকনো পাথরে। আমি কিন্তু দেখি সব প্রশ্ন চিহ্ন খড়্গ মূর্তি ধরে।'

সমাজের প্রতি স্তরের এই ব্যর্থতাবোধ যা থেকে ক্রমবর্দ্ধমান ধূমায়িত বিক্ষোভ,

সেই ফেলে আসা শীতলাইয়ের বটগাছ, রোদ্দুরে হাওয়ায় হীরাজ্বলা পাতা নড়া থেকে আজকের এ্যাসফল্ট শহরের এক রক্তাক্ত ডায়েরী 'জামায় রক্তের দাগ' যার পাতায় কবি নিজেকে সমীক্ষা করেছেন। দেখেছেন কি ভাবে তার মূল্যায়ণ হয়।

: ৫৫/৫৬টি কবিতার মধ্যে দু একটি কবিতার সংকলন ভুক্তি আমার ভালো লাগেনি। যে মেজাজের কবিতায় বইয়ের নামকরণে সার্থকতা, যেখানে উৎসর্গীকৃত কবিতাগুলিও যেখানে এই পটভূমিকেন্দ্রিক সেখানে ব্যক্তিগত প্রেমভাবনা কিংবা বিষাদ একটু বেসুরো হয়ে বাজবেই।

: জামায় রক্তের দাগ বোঝাবার জন্যে কভারময় লাল রঙ বুলিয়ে আগমার্কা কভার না করার জন্যে প্রতিথযশা শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই।

সম্পূর্ণ আরেক মেরু থেকে অন্য অবয়বে এই যন্ত্রণার মূল্যায়ণ করেছেন আলোর পাহাড়ে'র কবি সতীকান্ত গুহ।

এর আগে শ্রী গুহের কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না (কবিতা বলতে এক্ষেত্রে আমি ছড়ার কথা বলছি না), থাকার কথাও নয়। কারণ এই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং আমার যদ্দূর মনে হয় কবির কবিতা ইতিপূর্বে পত্রস্থ হয়নি অথচ কবিতাগুলো পাঠ করে আমি বেশ কিছুটা অবাক হয়েছি। আমার মনে হয়েছে আধুনিক কবিতা সম্পর্কিত তাঁর ধ্যানধারণা অনেকদিনের অর্থাৎ মাটি তৈরী হয়ে মনের একান্তে কাজ করে গেছে এবং অকপটে বলা যায় প্রথম কাব্যগ্রন্থে তিনি তাঁর যথাযোগ্য সম্মান আদায় করে নেবেন। মেজাজে চিত্রকল্পে, লিরিকধর্মীতায় সর্বোপরি তাঁর এক রোম্যান্টিক কবি-মন এক পূর্ণতার অনুগামী।

: এই বিক্ষোভের জগৎ থেকে, চিরন্তন প্রেম, পৃথিবীর অমেয় সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা এবং বিষাদাচ্ছন্নতা। এই চিরন্তন চাওয়া আর চাওয়ার উপরে উত্তরণ এবং না পাওয়ার হাহাকার কবির সার্থক চিত্রকল্পে চিত্রায়িত করার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সবচেয়ে সুখের কথা কবি বুড়িয়ে যাননি। একজন আধুনিক যুবকের নৈরাশ্য ও একাকীত্ববোধে যখন আর্তনাদ শুনি—'আমার দিগন্তে হাহাকার / শুষ্ক রসহীন ধূ ধূ বালু পারাবার / যুগ যুগ আছে প্রতীক্ষায় / তোমার আশায়'। একক কবি বিশাল তটভূমির সামনে দাঁড়িয়ে জীবনবৃত্তের বালিয়ারী থেকে একদিকে ভেঙে পড়া বিষাদের ঢেউ আর নতুন ঢেউয়ের সঙ্গীত শুনছেন—

'আমাদের হাহাকার, তোমার আমার, / অন্য কোনোখানে, / সেখানেও ভাঙে ঢেউ ভাঙার উপর /' সে এক অদৃশ্য বেলাভূমি, খেলাঘর / আর এক আকাশ কিন্তু একই আবিস্কার / আর এক রকম কিন্তু একই তার মানে।' এই যে ফিরে আসা, শেলীর Homeless clouds এর মতো ঘুরে ফিরে কবি- দিগন্তে বিস্তৃত হয়, তাকে চিত্রায়িত করাই তো কবির কৃতিত্ব।

'আলোর পাহাড়ে'র গ্রন্থে কবিতা কখনো বিষাদে গম্ভীর কখনো তীর্যক ছন্দ ও সাট্যায়ারে অলংকৃত। জীবন থেকে আরেক জীবনে অন্ধকার থেকে আলোর বন্দনায় কবির প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠস্বর কবিতায় তার ভূমিকা সম্বন্ধে পাঠককে ওয়াকিবহাল করবে কারণ কবি যখন তার পথ সম্বন্ধে নিশ্চিত তখন তার ভূমিকা একটা স্থির সীমারেখা ছুঁয়ে যায়—'আরো পাখি দেখি অদৃশ্য খাঁচায় / দিনে রাতে ডানা ঝাপটায়। আমি তাকে দিতে পারি সোনালী আকাশ। দেবতার নিশ্বাসের মতন বাতাস।' কবিতায় কবির দার্শনিক মন নিয়তই কাজ করেছে কিন্তু রসকষহীন দর্শন তো আর কবিতা নয়, বিজ্ঞান ও না। শ্রীগুহকে ধন্যবাদ তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে সুললিত কাব্যের চাদর জড়িয়েছেন তাই—জীবন থেকে জীবনোত্তর মহাসঙ্গীতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি।

: কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।

কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলী স্বকীয় বৈশিষ্টে উজ্জল সেখানে 'সমস্যা' 'ছলনা' কিংবা 'বাদল দিনের' মতো কবিতাগুলো সংকলিত করার আগে কবি একবার ভেবে দেখলে পারতেন! এছাড়া হাহাকার, দিগন্ত কথাগুলি বহু ব্যবহারে খানিকটা ধার কমে গেছে। কারণ যন্ত্রণার আত্মিক কথাবার্তাগুলো মাঝে মাঝে স্বগত থাকাই ভালো। কভারের লাইনগুলো দিয়ে (শিল্পীর নাম বলতে পারছি না) কভারের যা ইমেজ আঁকা হয়েছে তাতে পাহাড় সম্পর্কিত কিছু বোঝা গেলেও কবিতার মূল সুরের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন। এক্ষেত্রে শিল্পীর গোটা বইটা একবার পড়ে নেওয়া উচিত ছিল।

—শান্তনু দাস

জামায় রক্তের দাগ। মনীন্দ্র রায়। সারস্বত লাইব্রেরী। চার টাকা। পৃষ্ঠা—৭৪।
আলোর পাহাড়। সতীকান্ত গুহ। বাক সাহিত্য। তিন টাকা। পৃষ্ঠা—৪০।

দিব্যেন্দু পালিত বাঙ্গালী পাঠকের কাছে ইতিমধ্যেই এক পরিচিত নাম। সেই পরিচিতি মূলত কথাসাহিত্যিক হিসাবে। তার আরেক সমান্তরাল রচনাধারাও বেশ কিছুদিন থেকেই ইতস্তত: কবিতা পত্রগুলিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, যদিও সংখ্যায় তারা অপ্রচুর, বিক্ষিপ্ত, এবং প্রায় চোখে না পড়বার মতো অনিয়মিত। তবুও সতর্ক পাঠকের অলক্ষ্য থাকেনি দিব্যেন্দু পালিত সব অর্থেই একজন কবিরই নাম। কবিতা রচনায়ও তিনি সমান কুশলী এবং প্রায়শই সার্থক। গ্রন্থটি তাই প্রতীক্ষিত ছিল।

আমরা যারা তাঁর গদ্য এবং কবিতায় সমান উৎসাহী; এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ তাদের কাছে এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। যারা তাকে শুধু সার্থক গল্পকার হিসাবেই জানেন, তারা এখানে এক সম্ভাবনাময় কবিপদক্ষেপ আবিষ্কার করে খুশি হবেন। এখানে কবিতার সমস্ত আধুনিক চরিত্রলক্ষণ উপস্থিত। কি প্রেমের কবিতায়, কি নিসর্গ বর্ণনায়, এমন কি সমসাময়িক সমস্যার উপস্থাপনেও বিশেষভাবে যা চোখে পড়ে তা হ'লো শব্দব্যবহারের কুশলতা; এবং সে শব্দ সমসময়েই মনের ভাব প্রকাশের পূর্ণ পরিপূরক। কেন না কবিতা মূলত শব্দ দিয়ে নয় আইডিয়া দিয়েই লিখতে হয়। শব্দ বাহন হতে পারে, কিন্তু শব্দই কবিতা নয়। এ সম্পর্কে পৃথিবীর এক বিখ্যাত কবির উক্তি এককালে বিশ্বাস করলেও এখন ভ্রান্ত বলে মনে হয়। প্রায়শই পয়ারে, কচিৎ মাত্রাবৃত্তে লিখিত দিব্যেন্দুর কবিতাগুলি নির্মাণে দৃঢ়, বাহুল্যবর্জিত, পংক্তিগুলি তার কবি-চরিত্রকে অনায়াস সাফল্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

"হৃদয় মহার্ঘ্য বস্তু, তার তুল্য প্রতিদান নেই।
যাকে ভালবাসি তার মুখে রাখি ভীষণ চুম্বন;
সচকিত হয়ে শুনি আকস্মিক ময়ূরের ডাক—
কুমকুম-রাঙানো নখ বিদ্ধ করে দু-চোখের মণি।
অন্ধতা তবু ভালো, পরিপার্শ্ব সুখে আছে, থাক,
কলকাতা কানের কাছে অনিরুদ্ধ প্রতিধ্বনি করে।"

এই কবিতাতেই খানিকটা আগে আমরা পড়ি কবির আত্মসমীক্ষা,

"সবার কুশল জানি। কেউ জানো আমার কুশল?
আমি কে, অথবা, সেই আমি কিনা, কিংবা অন্য কেউ—
ইতিহাস বৃত্তান্তের চারিপাশে অনন্ত ভূগোল
আদি-মধ্য-অন্তহীন চতুঃসীমা পেশ করে রাখে।
সন্তায় ফুলের মালা পাওয়া যায় এ-শহরে এবং খোঁপাও,
ইশারায় ডাক দিলে বন্ধুতা ও বাহুর আহ্লাদ
যুগপৎ বিবমিষা, কবিত্ব ও শঙ্কাহীন রমণী-আদর—"

(সবার কুশল জানি: পৃ ৫৩)

দিব্যেন্দুর কবিচরিত্রে একটি বিশেষ লক্ষণ, আপাত-তির্যক প্রায় সাংকেতিক সঙ্গবদ্ধ বাচনভঙ্গীর আড়ালে সত্য উপস্থাপন করা। যেমন,

"হুলুস্থুল বেধে গেল চতুর্দিকে—
দেয়ালে, চৌকিতে
রমণী লুকালো মুখ;
ছিন্ন বুক, আ-শীতল বাহু।
কিন্তু তার স্নেহের অসুখ
ছুঁয়ে গেল একে-একে ছা-পোষা কেরাণী, ভৃত্য,
ধুরন্দর কবি।
সর্বোপরি বলিষ্ঠ প্রেমিক
পাপোষে জুতোর ধুলো ঘষে ঘষে শব্দে, জাগরণে
জ্যা-বদ্ধ উপোস ছিঁড়ে হাসলো হি-হি করে।

আমি ইচ্ছা করেই মাত্রদুটি কবিতা থেকেই এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম। মনে হয় এতে কবির আঙ্গিক, প্রকরণ, শব্দব্যবহার ছন্দ সম্পর্কে পাঠকের অন্তত একটি ধারণা গড়ে উঠবে। কেননা সমালোচকের কাজ শুধু পোষ্টমর্টেম নয়; কবিচরিত্রের বিশেষ লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয় দিক থাকলে সেখানে আলোকপাত করে সম্ভাব্য পাঠককে আগ্রহী করে তোলা। অর্থাৎ সূত্রটি শুধু ধরিয়ে দেওয়া, কখনো বা ইঙ্গিত, যাতে যে কোনো বুদ্ধিমান পাঠকের মনে সমগ্র বইটি সম্পর্কে আগ্রহ একাগ্র থাকে। দিব্যেন্দু পালিতের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়; কেননা এটি যে তার শুধু প্রথম কবিতাগ্রন্থ তাই নয়, এটি

নিজের কাছেও বিশেষ পরীক্ষা। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে বিচরণ ক্ষমতা সকলের থাকে না। ইচ্ছা থাকলেও যোগ্যতা থাকে না। তা ছাড়া সাহিত্যের এক শাখায় সাফল্যলাভ করে দ্বিতীয় শাখায় পদার্পণ করার বিপদও অনেক। যদি দ্বিতীয়তে প্রার্থিত সাফল্য না আসে তবে প্রথমের জন্য দীর্ঘ সুন্দর শ্রমও অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। আশার কথা কবি আমাদের নিরাশ করেন নি। ছন্দের ক্ষেত্রে দু-এক যায়গায় কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা নিলেও সমগ্র বইটিতে এক সত্যিকারের কবিমন অনায়াসলক্ষ্য। কবি ভবিষ্যতে প্রথমার সাফল্যে যদি দ্বিতীয়াকে, বলা ভাল অদ্বিতীয়াকে, বর্জন না করেন তবে তার কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা গচ্ছিত রইল।

পরিশেষে একটি কথা উল্লেখ না করলে বর্তমান আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। বইটির একটি অসাধারণ প্রচ্ছদ এঁকেছেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা বইয়ের প্রচ্ছদ তিনি প্রায় সবসময়েই ভাল আঁকেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে তিনি যেন বিশেষণের ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন।

—রাজীব সেন

রাজার বাড়ি অনেক দূরে। দিব্যেন্দু পালিত। মূল্য তিন টাকা। প্রকাশক—অরুণা প্রকাশনী। পরিবেশক—সিগনেট বুকশপ। কলকাতা-১২